আপনি কি সুন্দরী হতে চান ?

সৌন্দর্য



নীলিমা চক্রবর্তী

আপনি কি সুন্দরী হতে চান?

সৌন্দর্য

নীলিমা চক্রবর্তী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
কলিকাতা পুস্তক মেলা ১৯৮৩
মাঘ, ১৩৮৯

দ্বিতীয় সংস্করণ :
জানুয়ারী, ১৯৮৯
মাঘ, ১৩৯৫

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
বিপুল গুহ

অলঙ্করণ :
অন্নদা মুন্সী
কাকলী চক্রবর্তী
নিমাই ঘোষ

মুদ্রাকর :
নেপালচন্দ্র পান
সোনালী প্রেস
২/এ ভোলানাথ পাল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

উপদেষ্টা
ফনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দাম : ১৬ টাকা
Rupees Sixteen only

আমার জীবনের একমাত্র পথপ্রদর্শক
সন্ন্যাসী-সাহিত্যিক শ্রীমৎ তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী
—শ্রীচরণেষু

নিবেদন

নিয়ম মাফিক নিছক একটা কর্তব্যেই এই ধরনের বইয়ে ভূমিকা লেখার হয়তো আর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যে প্রশ্নটি পুস্তক-রচনার সময় থেকে বার বার হানা দিয়ে ফিরেছে নিজেরই মনে তার একটি সরল জবাবদিহির জন্যেই এই ভূমিকার অবতারণা। প্রশ্নটি হলো লেখার জগতে এত কিছু বিষয় থাকতে হঠাৎ রূপচর্চার মতন একটা বিষয় নিয়ে লেখবার ইচ্ছে হলো কেন ? রচনার বিষয়বস্তুটি কি এতই সহজ না সহজে মনকাড়া (অবশ্যই মহিলাদের) যায় এই চিন্তায় ? এর উত্তর হলো আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও বিষয়বস্তুটি কিন্তু সত্যিই অতি দুরূহ। কালিদাসের যুগে নায়িকারা তাঁদের মেঘের মতন ঘন কেশরাশি শুকিয়ে নিতেন ধূপের ধোঁয়ায়। আর তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দেহ আরও উজ্জ্বল করতেন লোধ্র ফুলের রেণু ছড়িয়ে। আলস্যে মেদুর সেদিনগুলি ছিল তাঁদের লঘুপক্ষ। মন্দাক্রান্তা ছন্দে কাটতো জীবন। 'হায়রে কবে কেটে গেছে' সেই কালিদাসের কাল। এখন প্রাত্যহিক নিষ্ঠুর প্রয়োজনের নানা তাগিদে মেয়েদের পরতে হয় "জুতো-মোজা", চলতে হয় "সোজা-সোজা"। তবু বিধাতার দেওয়া সাধারণ রূপকেই নানাভাবে নানা ছন্দে সাজিয়ে গুছিয়ে অপরূপ করে তুলবার অদম্য ইচ্ছেটা যে থেকে যায় তার মধ্যেও !

দৈনিক বসুমতীর "বউঠাকুরাণীর হাট" সম্পাদনাকালে মেয়েদের মধ্যে এই আগ্রহের প্রকাশ দেখেছি নানাভাবে। রূপচর্চা সম্বন্ধে কোন রচনা প্রকাশিত হলেই সে সম্বন্ধে নানা প্রশ্নে ভরে উঠত দপ্তর। তাদের সেই সব জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে তখন ছুটতে হতো মা-দিদিমাদের ঘরে। ঘাঁটতে হতো নানা বিদেশী পুঁথিপত্রের পাতা। আর বাংলা ভাষায় এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বই-এর অপ্রতুলতা চোখে পড়তো তখনই ! তার পরও কেটে গেছে দীর্ঘদিন।

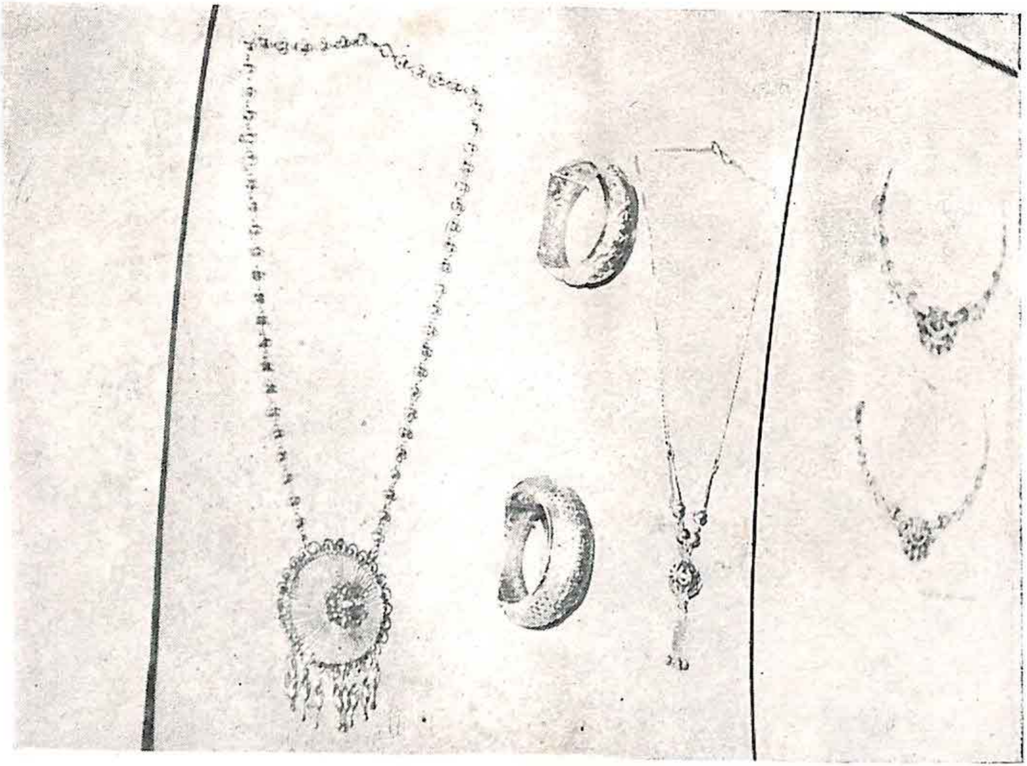
'বউ ঠাকুরাণীর হাট' সম্পাদনাকালে যে ইচ্ছার অঙ্কুরোদগম, বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পত্র-পুষ্পশোভিত হয়ে সেই ইচ্ছারই আজ সফল রূপায়ণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্প শ্রীঅন্নদা মুন্সী নিঃস্বার্থভাবে অনেকগুলি ছবি এঁকে দিয়ে বইয়ের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞতার আমার সীমা নেই। বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে সবদিক থেকে যে ঐকান্তিক সাহায্য পেয়েছি অনুজপ্রতিম শ্রীবিপুল গুহ'র কাছ থেকে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই, তাই তার থেকে বিরত থাকলাম। আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করেছেন রুবি বাগচী ও কিন্নর রায়। তাঁদের এই সাহায্যও ভোলার নয়।

আর সবশেষে যাদের দ্বারা বার বার অনুরুদ্ধ হয়ে এই প্রচেষ্টা সেই আগ্রহী পাঠিকাদের যদি কিছুমাত্র উপকার হয় তাহলেই সার্থক হবে সব আয়োজন।

নীলিমা চক্রবর্তী

সৌন্দর্য



সম্মেলন বা গেট টুগেদার ইত্যাদিতে ব্যবহারের গয়না।



“শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।”

কবির ভাষায় নারীর অতুলনীয় রূপ শুধু বিধাতার সৃষ্টি নয়। যুগে যুগে পৃথিবীর সেই প্রথম দিনটি থেকেই বোধহয় নারীর সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে তার প্রিয়তমের স্বপ্নে। প্রকৃতির নিবিড় শ্যামশোভায়, আলোর সুষমায়, সাগরের ঢেউয়ে, পাখীর কলকাকলীতে পুরুষ দেখেছে তার প্রিয়তমার ছবি। তাই প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মনোহারিণী করে সাজিয়ে তুলবার আকাঙ্খাটাও নারীর বোধহয় সেই আদিম যুগের। পৃথিবীর প্রথম জন্ম লগ্নে লাল টুকটুকে আপেলটার সৌন্দর্যে মুগ্ধ আর লোভী হয়ে উঠেছিল ইভই তো প্রথম। সৌন্দর্যের প্রতি এই আকর্ষণই নারীর নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলবার মূল অনুপ্রেরণা। এই প্রেরণাতেই আজও আমরা জানতে উন্মুখ হই অর্জুনের মতন পুরুষের প্রথমা প্রেয়সী হতে পারা দ্রৌপদী কৃষ্ণা হয়েও সুন্দরী বলে খ্যাতি পেয়েছিলেন কোন জাদুমন্ত্রে? আশ্রমকন্যা শকুন্তলা কোন মোহময়তায় ভুলিয়েছিলেন রাজা দুষ্মন্তকে? ক্লিওপেট্রা, হেলেন, রাণী পদ্মিনী—অতীতের ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে মন উধাও হয়ে যায় কোন সে কল্পলোকের দেশে।

শকুন্তলা, ক্লিওপেট্রা, পদ্মিনী না হলেও আমি, আপনি, যে কেউই একটু চেষ্টা আর যত্ন করলেই নিজস্ব একটা ধরনে পাঁচজনের চোখে যে সুন্দরী হয়ে উঠতে পারি তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

এই নিজস্ব ধরনটাই রূপচর্চা বা সৌন্দর্য সাধনার চাবিকাঠি। শুধু চাঁপা ফুলের মতন গায়ের রঙ, মেঘের মতন কালো চুল, পদ্মকলির মতন একজোড়া চোখ হ'লেই যে রূপসী হয়ে ওঠা যায় তার কোন মানে নেই। পথেঘাটে বা আপনার পরিচিত-জনদের অনেকের

মধ্যেই দেখবেন সত্যিকার সুন্দরী হয়ে উঠবার মতন সবই আছে, অথচ তবুও কেমন যেন সুন্দর লাগছে না ঠিক। ভাল রান্নাতে যেন সব থেকেও নেই এক চিমটে নুনের স্বাদ। তরকারীতে এই নুনের স্বাদের মতন রূপচর্চায় প্রথম প্রয়োজন আপনার স্বকীয়তা, আপনার চলনে-বলনে, বসায়-দাঁড়ানোয় এমনকি হাসবার ভঙ্গিটুকুতেও এমন একটা কিছু থাকা উচিত, যা সব সময় নিজস্ব মাধুর্যে আলাদা করে রাখবে আপনাকে সকলের মাঝখানে।

সুতরাং নিজস্ব ধরন বলে যে কটি বিষয় আপনাকে একেবারে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতন সহজ আয়ত্তে এনে ফেলতে হবে তা হল :

দাঁড়াবার ভঙ্গি

কোন সময় ঘাড় কুঁজো করে পেটের দিকটা সামনে ঠেলে দিয়ে দাঁড়াবেন না। ঘাড় আর মাথা সোজা করে পেট ভেতরের দিকে আর বুকটা সামনের দিকে সামান্য তুলে দাঁড়াবেন। প্রথম প্রথম একটু হয়তো অসুবিধে হবে এভাবে দাঁড়াতে, কিন্তু একটু খেয়াল রেখে কিছুদিন চেষ্টা করলেই একেবারে সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠবে এই অভ্যেস।

বসবার ভঙ্গি

মেয়েদের বসবার ভঙ্গি সব সময় খুব নরম আর শোভন হওয়া উচিত। মাটিতে বসলে বাঁ পায়ের ওপর ডান পা মুড়ে বসবেন। যদি বাঁ পাটা ভাঁজ করে গুটিয়ে রেখে বসেন, তাহলে ডান পা উঁচু করে তার ওপর থুতনি রেখে বসবেন। চেয়ারে বসলেও সব সময় একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলে পায়ের পাতা শাড়ি দিয়ে ঢেকে বসবেন। পায়ের নোখ যদি রাঙান থাকে তাহলে শুধু নোখের প্রান্তটুকু খোলা রাখবেন। পা মুড়ে বসলে হাঁটুর ওপর আগে হাত-দুটো একটার ওপর আর একটা দিয়ে তার ওপর থুতনি রাখবেন।



দাঁড়াবার ভঙ্গী (১)



দাঁড়াবার ভঙ্গী (২)



বসবার আদর্শ ভঙ্গী (১)



বসবার আদর্শ ভঙ্গী (২)

বসাটা যেখানেই হোক, বসবার সময় একটু খেয়াল করে হাতদুটো সবসময় বেশ একটা ছবির ভঙ্গিতে সাজিয়ে রাখবেন। আর মনে রাখবেন যেমন ভাবে যেখানেই বসবেন বসাটা যেন খুব মনোরম হয়। শক্ত হয়ে পা বেশী ছড়িয়ে বা পিঠ কুঁজো করে কখনো বসবেন না।

হাঁটবার ভঙ্গি

দাঁড়াবার মতন হাঁটবার সময়ও ঘাড় মাথা সোজা রেখে পেট নিচু আর বুক সামান্য এগিয়ে বেশ ঋজু ভঙ্গিতে একটু দ্রুত গতিতে হাঁটবেন। এতে হাঁটাটাই আপনার শুধু সুন্দর হবে না, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে খুব স্মার্ট দেখাবে আর ফিগারটাও বেশ একটা ছন্দময় হয়ে উঠবে দিনে দিনে।

আজকাল নানারকম হাই হিল (high heel) জুতোর চল হয়েছে। আপনি যদি খুব বেশী বেঁটে না হন তাহলে শুধু চল হয়েছে বলেই এরকম জুতো পরবেন না। সামান্য গোড়ালি উঁচু জুতো পরলে গোড়ালিটা উঁচু আর আঙুলগুলো সামনের দিকে চেপে থাকবার দরুন হাঁটবার ভঙ্গি সুন্দর হবে। সুন্দর ভাবে হাঁটা অভ্যেস করলে সমস্ত শরীরটা জুড়ে নেমে আসবে আপনার একটা বৈশিষ্ট্য, ইংরিজিতে যাকে বলে Grace, যা নিশ্চয়ই পাঁচজনের থেকে আলাদা করে তুলবে আপনাকে নিজস্ব আভিজাত্যে।

হাসি

কোন সে কবেকার যুগ থেকে সুন্দরীর মুখের হাসি নিয়ে কত কাব্য করে এসেছেন কবি। আকাশের চাঁদ, পাহাড়ের বুক ভেঙে ঝরে পড়া ঝর্ণার উচ্ছ্বাস, কাঁকনের রিনিঝিনি, জলতরঙ্গের রাগিণী—সে কত!

তাহলে দেখা যাচ্ছে সুন্দরী হবার পরীক্ষায় অনেকখানি নম্বর থাকছে প্রেয়সী মুখের মধুর হাসিতে। আপনি হয়তো আকন্দ ফুলের মতন সাদা ধবধবে এক সারি দাঁতের অধিকারিণী, গলাটা

হয়তো আপনার বাঁশির মতন সুরে বাঁধা। তাই বলে কি আপনি রাতদিন সেই ফুলের শোভা দেখিয়ে বেড়াবেন সকলকে, না বাঁশির সুরে মোহিত করে তুলবার চেষ্টা করবেন গোটা পৃথিবীটা ? না, তা করবেন না। উঁচুস্বরে প্রাণখোলা হাসি মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই হাসবেন। সেই হাসিতে যখন কোন কৃত্রিমতা থাকবে না, তখন আপনাকে যেমন প্রাণবন্ত আর মনোহারিণী লাগবে, তেমনি সব সময়ই জোরে হাসলে মনে হবে প্রগল্‌ভা।

হাসি সবসময় খুব মধুর করবার চেষ্টা করবেন। আপনার কথাবার্তায় কাজকর্মে সব সময় এক টুকরো হাসি ঠোঁটের ওপর ধরে রাখবার অভ্যেস করবেন। প্রয়োজনে সেই হাসি বিস্তৃত হবে খানিকটা, কিন্তু খুব বেশী মুখ খুলে অর্থাৎ বেশী দাঁত দেখিয়ে হাসবেন না কোন সময়। হাতের উল্‌টো পিঠ দিয়ে মুখের ওপর হালকাভাবে ঢেকে হাসলে ভারি শোভন দেখাবে আর ভঙ্গিটা বেশ মিষ্টি হয়ে সুন্দর একটা মাধুর্য ছড়াবে আপনার চারপাশে।

কথা বলা

অনেকেই হয়তো জানেন না শুধু মেয়েদের নয়—যে কোন মানুষের সৌন্দর্যের পঁচাত্তর ভাগ নির্ভর করে কথা বলার ভঙ্গির ওপর। কথা বলা একটা শিল্প। যে কোন কথা, বলার ভঙ্গিতে হয়ে উঠতে পারে সেইরকম শিল্পকলা যা যে কোন শ্রোতাকে মুগ্ধ আবিষ্ট করে রাখতে পারে সুন্দর একটা গানের রেশের মতন।

কথা সব সময় খুব সুন্দর করে বলবেন। কথার বিষয় যেন বেশীর ভাগ সময় এমন মনোগ্রাহী হয় যা শ্রোতার আগ্রহকে চুম্বকের মতন টেনে রাখতে পারে। আর কোন কিছু বলবার সময় খুব মিষ্টি একটুকরো হাসি ঠোঁটের মধ্যে ধরে রাখবার অভ্যেস করবেন। জোরে হাসবার দরকার হলে মাথাটা পেছন হেলিয়ে আলতো করে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসবেন।

এতকিছু নিয়মকানুন মেনে প্রতিদিন চলাফেরা করবার চিন্তাটুকুও প্রথমটা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার মনে হলেও কিছুদিন একটু যত্ন আর অধ্যাবসায়ের সঙ্গে চর্চা করলে এই সমস্ত ভঙ্গিমাই ক্রমশ আপনার আয়ত্তে আসবে একান্ত স্বাভাবিক হয়ে।

কথা বলার চেয়ে শোনার অভ্যেস করবেন বেশী। সকলেই চান আমি যা বুঝেছি—যা বলছি তা অন্যে মন দিয়ে শুনুক। ভাল করে বুঝুক। তাই সকলের কাছেই ভাল বক্তার চেয়ে ভাল শ্রোতার দাম অনেক বেশী। আপনি যদি ভাল বক্তা না হয়ে মনোযোগী শ্রোতা হবার অভ্যেস করতে পারেন, তাহলে আপনার সঙ্গ পাবার জন্যে—আপনাকে পছন্দ করবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠবে আপনার পরিচিত মণ্ডল।

সুন্দর ত্বকের জন্যে

রূপচর্চার শুরুতে অর্থাৎ রূপের পরিচর্যার বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে ত্বকের কথা। কারণ একমাত্র সুন্দর মসৃণ ত্বকই বাড়িয়ে তোলে মুখের লাবণ্য আর সৌন্দর্য। শুধু মুখের বা শরীরের চামড়ার ওপরে নামী দামী ক্রীম বা লোশন লাগালেই ত্বক সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। ত্বকের সঠিক পরিচর্যা হয় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিজের নিজের ত্বক সম্বন্ধে ঠিকমতন জ্ঞান থাকলে।

ত্বককে সাধারণত চারভাগে ভাগ করা যায়।

(১) স্বাভাবিক ত্বক।

(২) মিশ্র ত্বক।

(৩) তৈলাক্ত ত্বক।

(৪) শুষ্ক ত্বক।

(১) স্বাভাবিক ত্বক : যে ত্বক স্বাভাবিকভাবে মসৃণ, পরিষ্কার আর সজীব তাকেই স্বাভাবিক ত্বক বলা যায়। ভাগ্যবতী যাঁরা এই ত্বকের অধিকারিণী তাঁদের ত্বক সম্বন্ধে বিশেষ কোন সমস্যাই নেই। দিনে একবার বা দুবার নরম কোন সাবান ব্যবহার আর কয়েকবার ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ ধুলেই চলবে। গরম কালে দিনের বেলায় সামান্য একটু ময়শ্চারাইজার একবার হাল্কাভাবে লাগিয়ে নিতে পারেন। শীতকালে শুকনো হাওয়ায় চামড়ায় টান ধরে তাই হাল্কা ধরনের কোন ক্রীম বা দুধের সর বেশ একটু সময় নিয়ে ঘষে ঘষে লাগিয়ে এক টুকরো নরম কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়ে মুছে ফেললে চামড়া নরম থাকবে। তবে মুখের প্রসাধন তোলবার যা নিয়ম, তা কিন্তু ঠিক ভাবেই মেনে চলতে হবে।

(২) মিশ্র ত্বক : মিশ্র ত্বক যাদের, তাদের মুখের বিশেষ বিশেষ অংশ যেমন নাকের ডগা বা পাশ, চিবুক, তেলতেলে হয়ে ওঠে আর

অন্যান্য অংশ থাকে শুকনো। সাধারণতঃ কুড়ি বছর বয়স থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত ত্বকের মিশ্র ভাবটা থাকে। মিশ্র ত্বক যাদের তাদেরও সমস্যা খুব বেশী নয়, তাই পরিচর্যাও সাধারণ ত্বকের মতন সহজ। স্বাভাবিক ত্বকের মতন এক্ষেত্রেও তু' একবার সাবান আর ঠাণ্ডা জল ব্যবহারই যথেষ্ট। তবে মুখের তেলতেলে অংশগুলো বিশেষ খেয়াল করে দিনে একবার বা তুবার কোন astringent লোশন লাগিয়ে এক টুকরো তুলো বা স্পঞ্জ দিয়ে বেশ ঘষে ঘষে মুছতে হবে আর ভারী ধরনের কোন ক্রীম মুখের যে সব জায়গা সাধারণতঃ শুকনো থাকে, সেখানে বেশ ভাল করে লাগিয়ে নিলেই হবে। শাঁখের গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য পাতিলেবুর রস মিশিয়ে তেলতেলে জায়গাগুলোতে লাগালেও ভাল ফল পাওয়া যাবে।

(৩) **তৈলাক্ত ত্বক :** যাদের ত্বকে তেলের ভাব বেশী অর্থাৎ অল্পতেই মুখটা তেলতেলে হয়ে উঠে তাদের ত্বকের যত্ন নিতে হবে বিশেষভাবে। মুখের তেলতেলে অংশ যদি নিয়মিত যত্নে পরিষ্কার না করা হয় তাহলে ব্রণ, ব্ল্যাক হেড্‌স (Black heads), এ্যাকনে (Acne) এইসব হবার বেশী সম্ভাবনা থাকে, আর তাতে মুখের চামড়ায় নানারকম দাগের সৃষ্টি করে।

যাদের চামড়ার প্রকৃতি তেলতেলে তারা দিনে অন্তত চার/পাঁচবার মুখে সাবান ঘষে খুব সামান্য গরম জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে মুখ ধোয়ার অভ্যেস করবেন। যতবার মুখ ধোবেন ততবার নরম তোয়ালে দিয়ে একটু জোরে জোরে ঘষে বিশেষ করে তেলতেলে জায়গাগুলো মুছে ফেলবেন। দিনের মধ্যে যে কোন সময়ই হোক অন্তত একবার astringent lotion ব্যবহার করতে হবে। গরমকালে কোন ক্রীম ব্যবহার করবার দরকার নেই। শুধু শীতকালে চামড়ার কর্কশভাব এড়াবার জন্যে খুব হাল্কা ধরনের কোন ক্রীম অল্প পরিমাণে মেখে স্পঞ্জ দিয়ে মুছে ফেলবেন। এক চা-চামচ শাঁখের গুঁড়োর সঙ্গে আধ চা-চামচ লেবুর রস মিশিয়ে প্রলেপের মতন করে রাতে শোয়ার সময় মেখে আধঘণ্টা পরে ঝেড়ে ফেলবেন। রাধামাটি (যাকে চন্দনমাটিও

বলা হয়ে থাকে) গুঁড়ো করে গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রলেপ করে লাগালেও ভাল ফল পাবেন। যত্নে পরিচর্যায় কিছুটা কাজ হলেও সবচেয়ে খেয়াল রাখতে হবে খারাপ ব্যাপারে। বেশী মাখন, ঘি, তেল বা মশলা খাওয়া মোটেই চলবে না।

(৪) **শুষ্ক ত্বক :** যাদের ত্বক অর্থাৎ মুখের চামড়ার প্রকৃতি শুকনো তারা যতটা সম্ভব বেশী তেলতেলে জিনিস ব্যবহার করবেন। দিনের বেলায় স্নানের আগে নারকোল বা জলপাই তেল অনেকক্ষণ ধরে ঘষে ঘষে মেখে অন্তত আধঘণ্টা গায়ে শুকোবেন। এরপর বেসন আর কাঁচা দুধ গুলে প্রলেপ তৈরী করে সাবানের মতন মেখে স্নান করবেন। কোন সময়েই কোন astringent ব্যবহার করবেন না। রাতে ঘুমোবার আগে প্রসাধন ওঠাতে ঠাণ্ডা জলে একবার সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন। এরপর ভাল কোন ক্লিনসিং মিল্ক বা শুধুই খানিকটা কাঁচা দুধে তুলো ভিজিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাখবেন। একটু সময় দিয়ে নরম একখণ্ড কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়ে মুছে ফেলবেন। এরপর বেশ ভারী ধরনের কোন ক্রীম বেশ ঘষে ঘষে অনেকক্ষণ ধরে মাখবেন। এই ধরনের খসখসে ত্বকের পক্ষে আলু বা শশার রস খুবই উপকারী। এছাড়া সাদা চন্দনও প্রলেপের মতন করে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। চন্দন বা শশার রস যে কোন ত্বকেই সজীবতা এনে একটা অনুপম লাবণ্য ফুটিয়ে তোলে। রুক্ষ ত্বকের পক্ষে এই স্বাভাবিক সজীবতার প্রয়োজন অনেক বেশী। খাবারেও তেল, ঘি, মাখন বা চর্বি জাতীয় জিনিস যাতে বেশী থাকে সেদিকে নজর রাখবেন আর খাবেন প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডা দুধ।

ত্বক যাই হোক, যে কোন ত্বককেই সুস্থ আর সজীব করে ধরে রাখাটাই হলো রূপচর্চার গোড়ার কথা। প্রচুর পরিমাণ জল রূপ-চর্চার সবচেয়ে বড় আর সহজ উপকরণ। দিনে অন্তত পাঁচ / ছয়বার প্রচুর পরিমাণ ঠাণ্ডা জল ঝাপটা দিয়ে দিয়ে মুখ ধোওয়া উচিত। জোরে জোরে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিলে ক্লান্ত স্নায়ুগুলো সজীব হয়ে ওঠে আর রক্ত চলাচল সহজ হয়ে মুখে সুন্দর একটা সজীবতা ফুটে ওঠে।

খুব বেশী সাবান ব্যবহার করা কোন সময়েই উচিত নয়। রুক্ষ বা ওষুধযুক্ত (medicated) সাবান কোন সময়েই মুখে ব্যবহার করবেন না। যতটা সম্ভব দামী আর কোমল (শিশুদের ব্যবহারের সাবান হলেই ভাল হয়) মুখের জন্যে ব্যবহার করবেন। দিনে অন্তত একবার বিশেষ করে দুপুরের দিকে বা রাতে শোয়ার আগে নরম কোন ক্রীম মুখে মেখে ত্বকে ম্যাসাজ করবেন। ম্যাসেজ বা মালিশ করবার সময় কোনরকমেই এলোমেলো ভাবে বা কর্কশ হাতে রগড়াবেন না। (ম্যাসাজ করার নিয়ম ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে দেওয়া হলো।)

দিনে বা রাতে যে কোন সময়েই হোক বাইরে থেকে ঘুরে আসা মাত্র মুখের প্রসাধন নিশ্চয়ই তুলে ফেলবেন। প্রথমে দু-চার বার শুধু ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে সমস্ত মুখটা ধুয়ে নেবেন। এরপর হাতে বেশ বেশী করে সাবানের ফেনা করে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে দিয়ে মুখ, কানের পাশ, গলা আর ঘাড়ে ঘষে ঘষে মেখে পরে বেশ খানিকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে এমনভাবে ধুয়ে ফেলবেন, যাতে প্রসাধন বা ধুলো ময়লার লেশটুকুও আর না থাকে। এরপর শুকনো কাপড় দিয়ে চেপে চেপে বেশ শুকনো করে মুছে নিয়ে খানিকটা ময়শ্চারাইজার লাগাবেন তুলো দিয়ে।

এইতো গেল মোটামুটিভাবে বিভিন্ন ত্বক সম্বন্ধে আলোচনা। এবার সাধারণভাবে কতগুলো তথ্য যা নিয়মিত মেনে চললে নারী-মাত্রেরই একান্ত কামনার ধন যে রূপলাবণ্য, তা অতি সহজেই হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেবে বলে যে বলা হয়, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে হলে

(১) কাঁচা হলুদ বাটার সঙ্গে বেসন আর কাঁচা দুধ মিশিয়ে প্রলেপ তৈরী করে স্নানের আধঘণ্টা আগে নিয়মিত মাখলে ত্বক মোলায়েম আর উজ্জ্বল হবে।

(২) শাঁখের গুঁড়োর সঙ্গে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে রাতে শোবার সময় নিয়মিত মাখলে ত্বক মোলায়েম আর উজ্জ্বল তো হবেই উপরন্তু চামড়ার ওপরের যে কোন রকম দাগও নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে।

(৩) মুসুর ডালের বেসনের (বেসনটা নির্ভেজাল পাবার জন্যে ঘরে করে নিলেই ভাল হয়) সঙ্গে কাঁচা দুধ মিশিয়ে প্রলেপ তৈরী করে আধঘণ্টা মুখে লাগিয়ে রেখে পরে আধ কাপ কাঁচা দুধ দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেললে ভারি সুন্দর একটা আলগা লাবণ্যে ভরে যাবে সমস্ত মুখ।

(৪) টাটকা কমলালেবুর খোসার রস সমস্ত মুখে বেশ ভাল করে মেখে শুকিয়ে নেবেন। মিনিট পনেরো বা আধঘণ্টা রেখে ইচ্ছে হলে ধুয়ে ফেলতে পারেন। পনেরো দিন ব্যবহার করার পর নিজের রঙের উজ্জ্বলতায় বিস্ময় মানবেন নিজেই।

(৫) প্রতিদিন দুপুরে বিশ্রাম করার সময় এক কাপ কচি ডাবের জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলবেন। দিনে দিনে রঙের উজ্জ্বলতা আর ত্বকের সজীবতা বাড়বে সুন্দর ভাবে।

(৬) খুব কচি শশার রস (রস বার করে বা পাতলা গোল গোল চাকতি করে কেটে) হাতে মুখে বেশ ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিন। নিয়মিত লাগালে দিনে দিনে আপনার রঙ কতটা উজ্জ্বল আর সজীব হয় দেখুন।

(৭) খুব বেশী রোদে যদি অনেকক্ষণ থাকতে হয়, তাহলে রোদে পুড়ে পুড়ে রঙটা কেমন যেন তামাটে হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ রোদে থেকে বাড়ি এসেই ঠাণ্ডা জায়গায় খানিকক্ষণ বসবেন। আস্তে আস্তে গায়ের ঘাম শুকিয়ে এলে দু তিনদিনের বাসি দৈ বড় চামচের দু চামচ নিয়ে তার সঙ্গে এক চামচ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে সমস্ত মুখে আর হাতে প্রলেপের মতন করে অন্তন পনেরো মিনিট লাগিয়ে রাখবেন। পরে ঠাণ্ডা জলে অনেকক্ষণ ঝাপটা দিয়ে দিয়ে ধুয়ে ধারা স্নান করবেন।

বিভিন্ন বয়সের ত্বকের সমস্যা

সাধারণভাবে ত্বককে চারভাগে ভাগ করে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা বা পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হলেও এমন কতগুলো সমস্যা আছে যা শুধু

বিশেষ বিশেষ বয়সের সময়েই দেখা দেয়। যেমন—ব্রণ, ব্ল্যাক হেড্‌স্‌, এ্যাকনে। এ সম্বন্ধে এখানে খানিকটা আলোচনা করা যাক।

ব্রণ ঃ এটি কৈশোর থেকে সদ্য যৌবনে পা দেওয়া সময়ের একটি বিড়ম্বিত সমস্যা। সদ্য কৈশোরে শরীরে যখন সবে নেমেছে ঢল, মনে নতুন খুশীর জোয়ার তখন—ঠিক তক্ষুনি একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চাইতে গিয়ে—ওমা! ও বাড়ির নন্দিতাদির মতন আয়নার মুখেও এসব কি? এবার তবে কি হবে? মুহূর্তে চোখে ধারা নামার জোগাড়। কিন্তু না, এতে এত ভয়ের কিছু নেই। কয়েকটি নিয়ম ঠিকমতন মেনে চললে সাধারণত ব্রণ সারাতে বেগ পেতে হয় না খুব একটা।

ব্রণ হলে সব থেকে আগে চেষ্টা করবেন পেট পরিষ্কার রাখতে। কারণ কোষ্ঠকাঠিন্যই ব্রণ হবার মূল কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রচুর পরিমাণে কাঁচা সব্জি আর ফল (যে কোন রকমেরই হোক) নিয়মিতভাবে খাবার অভ্যেস করবেন। রান্না তরকারীতেও সবুজ সব্জি আর শাকপাতা বেশী খাবেন। আর প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে জল। কোষ্ঠকাঠিন্য ছাড়াও বেশী ঝালমশলা দেওয়া খাবার খেলে, মুখে প্রসাধনের অবশিষ্ট বা ধুলোবালি জমিয়ে রাখলেও ব্রণ হবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ব্রণর হাত থেকে বাঁচতে হলে পেট পরিষ্কার রাখার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এসব দিকেও।

ব্রণ সাধারণত দুরকমের হয়। একরকম শুকনো ছোট ছোট ধরনের বিশেষ করে গালে, নাকের পাশে বা কপালে হয়ে থাকে। এই ব্রণ মুখে হলে দেখতে খারাপ লাগা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ক্ষতি করেনা। সাধারণতঃ তেরো বছর বয়স থেকে ১৯ / ২০ বছর বয়স পর্যন্ত এই ব্রণ ওঠে বলে একে বয়স ব্রণ বলা হয়। আর এক রকম ব্রণ বেশ বড় আকারের হয়ে একসঙ্গে কতগুলো করে চাপ বেঁধে থাকে। গালে, চিবুকে, কপালে বা মুখের যে কোন জায়গাতেই এই ব্রণ হতে পারে। পুঁজ জমার ফলে এতে প্রায়ই খুব যন্ত্রণা হয়। নোখ লেগে বা অন্য কোন কারণে বিষিয়ে গেলে কখনো কখনো ভয়ানক মারাত্মক হয়ে ওঠে। তাই

এই ধরনের ব্রণ হলে বিশেষভাবে সাবধান হওয়া উচিত। প্রথমত কোন কারণেই হাত বা কোন কিছু দিয়ে খোঁটার চেষ্টা করা উচিত নয়। খুব যন্ত্রণা হলে চন্দনের প্রলেপ দিলে ঠাণ্ডা হয়। এছাড়া গরম জলে 'ইপসন সল্ট' মিশিয়ে সেঁক দিলেও আরাম হয়। পুঁজ বা যন্ত্রণা বেশী হলে আর সময় নষ্ট না করে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্রণতে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

এ্যাকনে (Acne) ঃ ব্রণ ছাড়াও কিশোর বয়সের আর এক উপদ্রব হলো এ্যাকনে। এগুলো দেখতে অনেকটা ব্রণর মতই, তবে খানিকটা ফোলা ফোলা ধরনের হয়ে মুখের অনেকটা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। রঙ লালচে, অনেক সময়ই অল্প অল্প পুঁজ জমে যায়। ত্বক, বিশেষ করে সৌন্দর্যের পক্ষে এসব তো প্রচণ্ড ক্ষতিকারক। ছবির মতন সুন্দর সুষমা মাখা একখানি মুখে, সজীব প্রাণবন্ত ত্বকের ওপর কতগুলো ক্ষত ফুটে উঠলে কেমন দেখায়!

দিনে অন্তত দু/তিনবার নরম বেবিসোপে প্রচুর ফেনা করে কুসুম গরম জলে বেশ ভালভাবে মুখ ধোবেন। যতখানি সময় সম্ভব খোলা হাওয়ায় বেড়াবেন। সম্ভব হলে খুব ভোরবেলায় খালি পায়ে শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপর হেঁটে বেড়াবেন। সন্ধ্যেবেলাতেও খোলা মাঠে বেড়াতে পারলে খুবই ভাল হয়। যতটা সম্ভব কাঁচা সব্জি, আর ফল খাবেন। বেশী তেল, ঘি, চর্বি জাতীয় জিনিস মশলা বা মিষ্টি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করবেন। যতটা সম্ভব বেশী দুধ খাবেন। ঠাণ্ডা জলও খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে। দিনে অন্তত আধঘন্টা সূর্যস্নান (Sun bath) নিতে পারলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। তবে এত সত্ত্বেও না কমলে আর সময় নষ্ট না করে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

এরপর আছে ব্ল্যাক হেড্‌স্ (Black heads) ব্রণ আর এ্যাকনের মাঝামাঝি ধরনের জিনিস। গালে, বিশেষ করে মুখের যে অংশ বেশী তেলতেলে থাকে সেখানেই ছোট ছোট মাংসপিণ্ডের মতন এগুলো গজিয়ে ওঠে। সহ্য হয় এমন গরম জলে বরিক বা ফটকিরি মিশিয়ে নরম কাপড়ের টুকরো বা তুলো দিয়ে সেঁক নেবেন। বেশ কিছুক্ষণ সেঁক

নেবার পর জায়গাটা বেশ নরম হয়ে উঠলে একখণ্ড গজ বা নরম কাপড়ের টুকরো আঙুলের ডগায় জড়িয়ে ভেতরের ময়লাগুলো টিপে টিপে বার করে দেবেন। খেয়াল রাখবেন খালি হাত যেন কিছুতেই না লাগে। আর কোন সময়ই জোরে ঘষবেন না বা খুঁটবেন না কোন কারণেই। কিছুটা ব্লিচিং পাউডারের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোজেন পারোকসাইড মিশিয়ে প্রলেপের মতন করে ক্ষতস্থানে লাগাবেন। শুকিয়ে গেলে অল্প গরম জলে ধুয়ে ফেলবেন। ছোলার ডালের বেসনের সঙ্গে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে লাগালেও বেশ উপকার পাওয়া যায়।

তাহলে ত্বক সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখা গেছে যে রূপচর্চার গোড়ার কথা হলো সুন্দর, সজীব, লাবণ্যময় ত্বকের অধিকারিণী হওয়া এবং তা পেতে গেলে কতগুলো বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে জ্ঞান বা ধারণা থাকা উচিত।

(১) ত্বক সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান।

(২) নিজের নিজের ত্বকের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা।

(৩) খুব বেশী রোদ না লাগানো। বেশী গরম বা ঠাণ্ডা জল ব্যবহার না করা। ত্বকের ওপর প্রসাধনের অবশিষ্ট বা ধুলো-ময়লা জমতে না দেওয়া। কারণ এই জমে থাকা অবশিষ্ট বা ধুলো-ময়লা মুখে, বিশেষ করে তেলতেলে অংশগুলোতে বসে গিয়ে লোমকূপের মুখগুলো বন্ধ করে দেয়। যার ফলে এ্যাকনে, ব্ল্যাক হেড্স্ ছাড়াও নানারকম কুৎসিত দাগের সৃষ্টি হয়।

(৪) কখন ঠাণ্ডা বা গরম জল ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা উচিত।

(৫) তোয়ালে, স্পঞ্জ, মুখে ব্যবহার করবার তুলি বা পাউডার পাফ সব সময় খুব পরিষ্কার রাখা।

(৬) প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডা জল খাওয়া।

(৭) প্রতিদিন অন্তত আধ লিটার করে দুধ খাওয়া (সজীব ত্বক পেতে হলে)।

(৮) প্রচুর পরিমাণে ফলের রস খাওয়া (রঙের জেল্লা বা লাবণ্য বাড়াতে হলে)।

(৯) প্রচুর পরিমাণে কাঁচা সব্জি খাওয়া।

প্রলেপ বা মাস্‌ক্‌

ডিমের মাস্‌ক্‌ঃ একটা আস্ত ডিমের সাদা আর কুসুমের ভাগ দুটো আলাদা পাত্রে খুব ভাল করে ফেটান। সাধারণ বা শুষ্ক ত্বকের জন্যে প্রথমে কুসুমটা একটা চামচের উল্টো পিঠ দিয়ে ওপরের দিকে টেনে লাগাতে থাকুন, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে চোখের কোলে যেন কোনরকমেই না লাগে। খানিকটা শুকিয়ে এলে এর ওপর একইভাবে সাদা অংশটা লাগান। সম্পূর্ণ না শুকনো পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিন। এই সময় অর্থাৎ মুখে মাস্‌ক্‌ থাকা অবস্থায় হাসা, কথা বলা বা মুখে ভাঁজ পড়ে এমন কিছু করা চলবে না একেবারেই। নরম বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে বা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বিশ্রাম নেবেন। কিছুক্ষণ পর প্রলেপটা বেশ শুকিয়ে গেলে খানিকটা তুলো জলে ভিজিয়ে থুপে থুপে ধুয়ে প্রলেপটা তুলে ফেলুন। এরপর প্রচুর পরিমাণে কুসুম-গরম জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ সময় ধরে সমস্ত মুখটা ধুয়ে নিন।

যাদের তেলতেলে ত্বক তাদের কিন্তু ঠিক এর উল্টোটাই করতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে সাদা অংশটা লাগিয়ে পরে কুসুমের ভাগটা লাগাতে হবে।

মধুর প্রলেপঃ শুষ্ক ত্বকের পক্ষে এটি অত্যন্ত উপকারী। এক চা-চামচ মধুর সঙ্গে পনেরো ফোঁটা কমলালেবুর রস মিশিয়ে সমস্ত মুখটায় বেশ ভাল করে প্রলেপ দিন। মিনিট পনেরো রেখে বেশী করে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

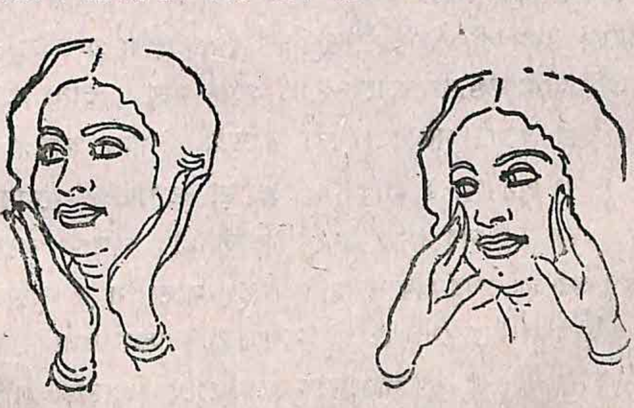
ইস্ট মাস্‌ক্‌ঃ (শুষ্ক ত্বকের জন্যে) একটা ডিম ভেঙে তার কুসুমটা আলাদা একটা পাত্রে নিয়ে দেড় চা-চামচ ইস্ট পাউডার আর দশ ফোঁটা জলপাই তেল মেশান। এবার এটি সমস্ত মুখে বেশ ঘন

প্রলেপ করে লাগিয়ে বিশ্রাম (বিশ্রাম নেয়ার নিয়ম আগেই বলা হয়েছে) নিন। কুড়ি / পঁচিশ মিনিট রেখে বেশ শুকিয়ে এলে কুসুম-গরম জলের ঝাপটা দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

মূলতানী মাটির প্রলেপ (Fullers Earth) : অল্প একটুখানি মাটি খুব মিহি করে গুঁড়িয়ে নিন। জল দিয়ে মুখে লাগাবার মতন পাতলা লেই তৈরী করুন। এরপর সমস্ত মুখে সেই প্রলেপটা বেশ ঘন করে লাগান। শুকিয়ে গেলে অল্প সময় রেখে সামান্য গরমজলের ঝাপটা দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। যদি আপনার ত্বক খুব বেশী তেলতেলে হয়, তাহলে এর সঙ্গে দশ / পনেরো ফোঁটা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নেবেন। সপ্তায় অন্তত তিনদিন নিয়মিত ভাবে এটি করে আয়নার দিকে চেয়ে দেখুন। আপনি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাবেন আপনার আশ্চর্য নতুন কান্তি আর রঙের উজ্জ্বলতা দেখে।

মুখের মালিশ (Masage)

(১) দু হাতের তালুতে বেশ অনেকখানি করে কোল্ড্ ক্রীম মেখে নিয়ে হাতদুটো খুব আস্তে আস্তে গলার নিচ থেকে ওপরের দিকে তুলে গাল বেয়ে কপালের রগ পর্যন্ত এনে আস্তে করে তিনবার ঘোরাতে হবে।



(২) গালের তলা, অর্থাৎ চোয়ালের নিচ থেকে দু'হাতের তালু খুব আস্তে আস্তে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে দুদিকে হাত ঘুরিয়ে

নাকের দিকে এনে আবার আস্তে আস্তে বাইরের দিকে টানতে হবে। এটি অন্তত পাঁচ-সাত মিনিট করতে হবে নরম হাতে।

(৩) চোখের কোল থেকে আরম্ভ করে ওপরের পাতার ওপর দিয়ে গোল করে আঙুল ঘোরাতে হবে।

(৪) নাকের পাশে কোন খাঁজ যাতে না জমেঃ নাকের পাশ থেকে নরম হাতে আস্তে করে গাল বেয়ে বাইরের দিকে টানতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে করতে হবে এই প্রক্রিয়াটি।



(৫) কপালের ভাঁজ এড়াতেঃ কপালের ওপর বাঁহাতের প্রথম ছু' আঙুলের মধ্যে ডান হাতের অনামিকা রেখে আস্তে আস্তে দুটো হাত সরিয়ে সরিয়ে ডান হাতের আঙুলটা বাঁ হাতের আঙুলের মধ্যে একবার ঢুকিয়ে পর মুহূর্তেই বার করে নিয়ে অল্প অল্প ঘষার মতন করবেন। খেয়াল রাখবেন ম্যাসাজের সময় কখনই হাতের চাপ বেশী জোর বা রুক্ষ যেন না হয়ে ওঠে।

যাদের বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে তারা প্রতিদিন একবার করে এই ম্যাসাজগুলো করবেনই। এতে মুখের স্নায়ুর ঠিকমতন ব্যায়াম হয়ে ত্বকের সজীবতা তো বাড়েই, উপরন্তু আলগা একটা শ্রীতে ভরে ওঠে মুখের লাবণ্য। এছাড়া প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে পঁচিশ বছর বয়সের পর থেকে অতি ধীর গতিতে শরীরে যে ভাঙনের শুরু হয়, তার প্রকাশ অতি নিষ্ঠুর সত্যে সমস্ত শরীর জুড়ে যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেই চেষ্টাই রূপচর্চার আসল কথা। নিয়মিত ব্যায়াম চর্চায় শরীরের রূপ লাবণ্যেকে ধরে রেখে বিধাতার আশীর্বাদের মতন ছু'হাত ভরে পাওয়া যৌবন দীর্ঘায়িত হয়।

বলিরেখা

এইবার ভাবুন মুখের উপর বলিরেখার কথা। তিরিশ বছর পার হয়ে গেলেই মুখের আর শরীরের মাংসপেশী ঢিলে হয়ে আসে খুব আস্তে আস্তে। অবশ্য তিরিশ বছর থেকে শুরু হলেও ৪০/৪৫ বছর বয়স না হলে খুব পরিষ্কারভাবে মুখের ওপর কোন রেখার ছাপ সাধারণত পড়েনা। কিন্তু তা হলেও তিরিশ বছর বয়স থেকেই চিন্তা বা পরিচর্যা শুরু করতে হবে এ ব্যাপারে। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় করে যে কথাটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো সবসময় বয়সটাই কিন্তু মুখের ওপর রেখা পড়ার একমাত্র কারণ নয়। মুখের গঠন অনুসারে অনেক সময় বয়স হবার আগেই অনেকের রেখা দেখা যায়। তার ওপর আপনার যদি ক্রমাগত ভুরু কোঁচকানো অভ্যেস থাকে তাহলে বয়সটা আপনার যাই হোক না কেন সমস্ত কপালটা জুড়ে ভাঁজের রেখা পড়বেই। ঠিক এই কারণেই সব সময় বেশী বেশী চিন্তা করবেন না। আপনি হয়তো বলবেন, 'ওমা', সংসার ধর্মে আজকাল এখনই একশো একটা ঝামেলা, তার ওপর আমার যদি থাকে উপরি আরো কুড়িটা, তাহলে হি-হি করে হাসব নাকি আমি দাঁত বার করে? না, তা নয়, দুঃখে বিপদে হাসে না মানুষে দাঁত বার করে! কিন্তু তবু শুধুমাত্র চিন্তা করেই কি সমাধান করা যায় সব সমস্যার? উল্টে সুন্দর সজীব মুখখানা জুড়ে সেই দুশ্চিন্তার বিজ্ঞাপন বয়ে বেরিয়ে লোককে ডেকে ডেকে বলা আমি দুঃখে আছি—ঝঞ্ঝাটে কাটাচ্ছি জীবন। সব সময় থুতনির তলায় হাত দিয়ে বসলেও ঠোঁটের পাশে বিশ্রী রকম রেখা পড়ে। অল্পেতে যাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন, অল্প ব্যাপারে বেশী ভাবনা-চিন্তা করেন, অর্থাৎ ছোট করে ইংরেজিতে যাকে বলে 'tempest in a tea cup' এই ধরনের যাঁদের স্বভাব তাঁদের ঠোঁটের পাশে আর ভুরুর ওপরে গভীর রেখা পড়বেই।

আমাদের চামড়ার নিচে যে কোষ থাকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরের ক্ষরণ শক্তি কমে গিয়ে দিনে দিনে চামড়ার শুকনো ভাব বেড়ে যায়। এইজন্যে চামড়ার এই সময় প্রচুর পরিমাণে তৈলাক্ত জিনিসের দরকার হয়। অল্প গরমজলে প্রচুর সাবানের ফেনা করে মুখ ধুয়ে ক্রীম জাতীয় কিছু প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার আগে লাগানো উচিত। দিনের বেলা ভালো কোন ময়শ্চারাইজার মেক-আপের নিচে লাগিয়ে নিলে সারাদিন রোদ, ধুলো বালির হাত থেকে রক্ষা কবচের মতন কাজ করে !

প্রতিদিন অন্তত পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে ম্যাসাজ করতে পারলে আপনার ত্বকের সজীবতা বজায় তো থাকবেই উপরন্তু মুখে বলিরেখাও পড়বে না তাড়াতাড়ি।

আগে যে ম্যাসাজের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখের ব্যায়ামও নিয়মিত করতে পারেন, তাহলে বয়সটা আপনার যতই সময়ের সঙ্গে দৌড় লাগাক আপনার মুখের কোমল একটা সজীবতা সম্মুখ সমরে তাকে হারিয়ে দেবেই দেবে।

মুখের ব্যায়াম

(১) পাশের দিকে আপনার হাঁ-মুখটা যতখানি পারেন পাশাপাশি ছড়িয়ে দিন। বন্ধ করুন। এবার হাঁ করুন। যতখানি সম্ভব বড় করুন। বন্ধ করুন। দশ মিনিট ধরে করুন ব্যায়ামটা।

(২) আপনার ভুরু দুটি যতখানি ওপরদিকে তোলা যায় তুলুন। যতখানি পারেন নিচু করুন। দশ মিনিট ধরে করুন।

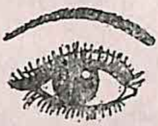
(৩) কোন কিছু চিবোনোর মতন করে মুখ নাড়ুন। প্রথমে বাঁ দিকে দশবার তারপর নিচের দিকে দশবার শেষে ডানদিকে দশবার।

(৪) মুখ যতখানি সম্ভব হাঁ করুন। চোখও বড় করুন যতটা সম্ভব। ভুরু যতটা সম্ভব ওপর দিকে তুলুন। তারপর যতটা সম্ভব জোরে বন্ধ করুন।

দিনের যে কোন সময় বিশেষ করে রাতে শুতে যাওয়ার আগে বেশ বেশী করে ক্রিম লাগিয়ে আগে ম্যাসাজ করে নিয়ে তারপর নিয়মিত এই ব্যায়ামটুকু করার অভ্যেস করুন। আপনার স্বাভাবিক রূপকে হয়তো অপরূপ করে তোলা যাবেনা কিছুতেই, কিন্তু বিধাতার দানকে নিজের চেষ্টায় আর সাধনায় সুন্দরতর আর দীর্ঘায়ত করে তোলা যায় নিশ্চয়ই। রূপচর্চ্চায় এইটাই আপনার হাতের গোপন চাবিকাঠি।

চোখ

কিছু পড়ছিলাম, একটু চমকালাম এক জায়গায় এসে। লেখক বলেছেন, সৌন্দর্যের প্রধান আর প্রথম কথা হলো সুন্দর এক জোড়া চোখ।



শুধু এক জোড়া সুন্দর চোখ! তাই কি? ভাবলাম বই নামিয়ে রেখে। মনে পড়ল মণীষাদির কথা। কালো বলে বিয়ের বাজারে যাকে সেলামি দিতে হয়েছিল নগদ পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু তবু কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে মণীষাদির সাগরের মতন অতল গভীর দুটি কালো চোখে। বিয়েতে পাঁচ হাজারের পরে পাসপোর্ট পেয়েও এখন শ্বশুরবাড়িতে সুন্দরী নাম।

ইংরিজি একটি মহিলা পত্রিকাতেও দেখছিলাম সেদিন চোখ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা—'সুন্দরী যদি হতে চাও তবে চোখকে সুন্দর কর। চোখ সাজাও।'

চোখের কোলে কাজলের দাগ টেনে ডাগর চোখদুটিকে আরও বড় করে তোলার প্রথা আমাদের দেশে তো কবে কোন যুগ থেকে চলে আসছে। বেরুতে হবে। চুল বাঁধলেন, মুখে সাবান লাগালেন, দিলেন ক্রীম, মেক-আপ আর পাউডারের প্রলেপ। দেখুন তো এবার আয়নার দিকে চেয়ে। বেশ সুন্দর লাগছে কি এখনই? কি যেন একটা নেই নেই মনে হচ্ছে না কেবল? আসলে আপনি যে এখনও চোখই সাজাননি আপনার। তাই এত কিছু প্রসাধন সত্ত্বেও কেমন যেন সুন্দর লাগছে না ঠিকমতন। তাহলেই ভাবুন রূপচর্চায় বা সত্যিকার সুন্দরী হতে গেলে একজোড়া সুন্দর চোখের অবদান

কতখানি। কিন্তু সেই একজোড়া কাজল-কালো স্বচ্ছ চোখ যা আপনার শরীরের, মনের, এমনকি আপনার সমস্ত প্রকৃতিটারই প্রতিচ্ছবি, যার অনিন্দ্যতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আপনার সমস্ত বেশবাস, প্রসাধন, সেই সৌন্দর্য কিন্তু শুধুমাত্র সাময়িক প্রসাধন দিয়েই ধরে রাখতে পারবেন না বেশীদিন। তাই আলস্য করে এই অনুপম সম্পদকে নষ্ট না হতে দিয়ে এতবড় দিনটার মধ্যে অন্তত কিছুক্ষণ সময় রাখুন তার যত্ন আর পরিচর্যার জন্যে।

যাঁরা সারাদিন পড়াশোনা বা সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করেন তাঁদের চোখের বিশেষ যত্ন আর পরিচর্যা করা উচিত। ক্লান্ত আর অবসন্ন চোখ মুখের ওপর একটা বিষণ্ণতার ছায়া ফেলে। একটানা বেশীক্ষণ চোখের কাজ করলে মাঝে মাঝে চোখকে বিশ্রাম দিতেই হবে। এর সবচেয়ে সহজসাধ্য উপায় হলো কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্তত পনেরো মিনিট চোখকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া। যতটা পারা যায় সবুজের দিকে চেয়ে থাকতে পারলে খুব ভাল হয়। না হলে নীল আকাশের বিস্তারের দিকে অপলক স্থির দৃষ্টিতে যতক্ষণ পর্যন্ত চোখ না জ্বালা করে চেয়ে থাকবেন।

অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কাজ করার ফলে যদি চোখ ব্যথা করতে আরম্ভ করে আর চোখের মণিদুটো কেমন যেন শক্ত হয়ে উঠেছে বলে মনে হয় তাহলে কাজ বন্ধ করে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে। এই সময় ঘরের সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে একেবারে অন্ধকার করে নরম বিছানায় চিৎ হয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়তে পারলে ভাল হয়। তা না সম্ভব হলে চেয়ারের মাথায় মাথাটা হেলিয়ে হাতের পাতাদুটো ঠোঙার মতন করে চোখদুটো ঢেকে ফেলবেন যাতে বাইরের আলো কোনরকমেই চোখে লাগতে না পারে। মিনিট পনেরো এইভাবে থাকার পর ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলবেন।

যাঁদের কাজের প্রকৃতি এমন যে সারাদিন শুধু চোখের কাজই করতে হয়, তাঁরা রাতে সব কাজের পাট শেষ করে বিছানায় শুয়ে এক কাপ ঠাণ্ডা জলে চা-চামচের আধ চামচ বোরিক এ্যাসিড ফেলে

এক টুকরো তুলো বা একখণ্ড খুব নরম কাপড় ঐ জলে ভিজিয়ে সামান্য নিঙড়ে বন্ধ চোখের ওপর দশ/পনেরো মিনিট রাখবেন। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন নিয়মিত এই পরিচর্যাটুকু করতে পারলে আপনার ক্লান্ত চোখের সজীবতা ফিরিয়ে এনে চোখকে উজ্জ্বল করে তুলবে আবার নতুন করে।

সপ্তাহে একদিন এক কাপ ঠাণ্ডা জলে সামান্য ফটকিরির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল মিশিয়ে চোখ ধুলেও চোখের কোনো রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে না। বসন্তের যেমন টীকা—চোখ ওঠারও তেমনি এটি একটি প্রতিষেধক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

দুপুর বেলা যদি বিশ্রাম নেবার সময় পান তাহলে খুব কচি শশা পাতলা চাকতি করে কেটে বোজা চোখের ওপর বারবার ঘুরিয়ে রাখুন।

চোখে কখনো খুব বেশী ঠাণ্ডা বা গরম লাগাবেন না। রোদের সময় বাইরে বেরুতে হলে রঙিন চশমা ব্যবহার করবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, কোন সময়ই যে কোন দোকান থেকে শস্তা দামের রঙিন চশমা কিনবেন না।

রাতে শুতে যাওয়ার আগে দু'ফোঁটা করে কাঁচা দুধ চোখে দিলে চোখের সাদা অংশটা উজ্জ্বল হয়।

সুন্দর চোখের জন্যে কয়েকটি ব্যায়াম

চোখের সজীবতা আর উজ্জ্বলতা ঠিক মতন পেতে হলে কতগুলো ব্যায়াম নিয়মিত করতে হবে।

(১) ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চোখ ধোবার সময় মগের মধ্যে যতটা ধরে ঠাণ্ডা জল নিয়ে চোখে জোরে জোরে জলের ঝাপটা দিন বারবার।

(২) আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে (দিনের মধ্যে যে কোনো সময়) মাথা সোজা রেখে শুধু চোখের তারাদুটো ডানদিক থেকে বাঁ দিকে ঘোরান কয়েকবার। পাঁচ মিনিট চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিন। আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একই ভাবে মাথা সোজা রেখে একবার ওপরে, পরক্ষণেই আবার নিচের দিকে ওঠানামা করান শুধু তারাদুটো।

(৩) বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে একখণ্ড কাপড় বা তুলো একবার ঠাণ্ডা আর একবার গরম জলে চুবিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেঁকের মতন করে নেবেন।

(৪) আয়নার মধ্যে ঠিক আপনার চোখের মধ্যবিন্দুর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে পাতাদুটো বড় করে তাকান। কিছুক্ষণ ধরে রাখুন সেইভাবে তারপর বন্ধ করুন খুব ধীরভাবে টানটান করে।

প্রতিদিন অন্তত পাঁচ মিনিট করে করতে হবে প্রতিটি ব্যায়াম। ধৈর্য ধরে নিয়মিত চর্চায় চোখ শুধু ভালই থাকবে না, দেখতে দেখতে দিনে দিনে কাজলা দীঘির কাজল কালো জলের উচ্ছলতা নামবে আপনারও দুটি চোখের তারায়।

এখন এত সাধনায় যত্নে যে সম্পদ পাওয়া গেল হাতের মুঠোয়, তাকে ধরে রাখতে সঙ্গে সঙ্গে চাই সুষম খাদ্য।

চোখের দৃষ্টি ভাল রাখার জন্যে প্রধানত প্রয়োজন ভিটামিন 'এ'। এই ভিটামিনের অভাবে অনেক সময় রাতকানা রোগও হতে পারে। চোখের যে গ্রন্থী থেকে জল বেরিয়ে চোখের যে কোনো ময়লা পরিষ্কার করে চোখকে সুস্থ, সজীব আর উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে, সেই গ্রন্থীকে প্রাণবন্ত করে রাখতে চাই প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ'। তাছাড়া প্রয়োজন ভিটামিন 'সি' আর 'বি'-এরও।

মাছের মাথা, দুধ, বীট, গাজর, লেটুসপাতা, হেলেঞ্চা শাক, পাতিলেবু, আমলা, ফলের রস আর দুধের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এই সব ভিটামিন। তাই চোখের সৌন্দর্য আর স্বাস্থ্যের জন্যে আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ভিটামিন 'এ', 'বি' আর 'সি' নিশ্চয়ই রাখতে হবে।

এরপর আছে বিশ্রাম। চোখের ঠিকমতন সৌন্দর্য বজায় রাখতে চাই প্রয়োজন মতন ঘুম। ঘরে বাইরে সারাদিন যত কাজই আপনি করুন, প্রয়োজন মতন ঘুম আর সামান্য কিছু সময় নিয়মিত ব্যায়াম করতে পারলে চোখের সব ক্লান্তি সরে গিয়ে নতুন উজ্জ্বলতায় ভরে

উঠবে আবার ছুটি চোখ। নাহলে ক্লান্ত চোখের কোলে দিনে দিনে গভীর হয়ে উঠবে কালির ছোপ, নানারকম রেখার আঁকিবুকি আর ফোলা ফোলা মাংসল ভাব। এর পরও চোখের কোলে মিষ্টি একটুখানি কাজলের টান বা মাসকারার নিপুণ কারুকার্য রচনার কথা ভাবতে পারবেন কি আপনি নিজেই ?

তাই সুন্দর একজোড়া সজীব চোখ পেতে হলে চাই নিয়মিত সুষম খাদ্য, ব্যায়াম আর ঘুম।

এই তো গেল আপনার পদ্মকলির মতন ছুটি নয়নের কথা। কিন্তু পদ্মকলির উজ্জ্বলতা চোখের তারায় আপনার যতই খুশীর জোয়ার আনুক তার ওপর গভীর ঘন পক্ষ যদি ছায়া না ফেলে তাহলে স্বপ্নালু আবেশে ভরবে না যে মন কিছুতে। সুতরাং এবার আঁখিপক্ষ আর ভ্রূযুগল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

আমাদের দেশে আগের দিনের মেয়েরা অর্থাৎ আমাদের মা-দিদিমারা সদ্যোজাত শিশুর পরিচর্যার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পরম্পরা শিক্ষায় নিপুণ হাতে শিশুকে তেল মাখানো, স্নান, মালিশ করানোর সময় চোখে ঘন করে পরিয়ে দিতেন রসুনের কাজল। আর সেখানেই শেষ নয়। শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ সৌন্দর্যের প্রতিও থাকত তাঁদের যথেষ্ট মনোযোগ। তাই ছোট্ট সরু চিরুনী দিয়ে শিশুর ভুরুর লোম আঁচড়ে দিতেন তাঁরা নিয়মিত যত্নে। আর সেই রেখার টানে টানে কাজলের দাগ আঁকতেন শিল্পীর আঁকা কোনো ছবির মতন। তাঁরা জানতেন বা বিশ্বাস করতেন যে, নিয়ন্ত্রিত পরিচর্যায় সত্যি সত্যিই ভুরু সুন্দর আর ছন্দবদ্ধ হয়ে ওঠে দিনে দিনে। রূপচর্চার একটি অতি প্রয়োজনীয় তথ্য হিসেবে তাই মনে রাখা উচিত যে, ভুরুর জন্যে যে ব্রাশ থাকে তা দিয়ে প্রতিদিন নিয়মিত ব্রাশ করলে যে কোনো ভুরু দিনে দিনে শিল্পীর পটে আঁকা ছবির মতন মনোহর হয়ে উঠবেই উঠবে। তবে ভুরু যদি অশোভন ভাবে এলোমেলো বা বেশী মোটা হয় তাহলে সন্না দিয়ে অপ্রয়োজনীয় লোমগুলো তুলে ফেলা উচিত। চোখের ওপরের কোণ থেকে সরু, মাঝখানটায় ধনুকের মতন বাঁকা আর সামান্য মোটা

হয়ে আবার সরু হয়ে ঢালুভাবে নেমে আসবে পাশ দিয়ে। এই হচ্ছে সুন্দর ছন্দময় একটি ভুরুর ছবি।

সন্না দিয়ে একটা একটা করে লোম তুলতে প্রথম প্রথম ব্যথা লাগবে নিশ্চয়ই, তবে ক্রমাগত অভ্যাসে ধীরে ধীরে সহনীয় হয়ে উঠবে সব। আর সুন্দরী হতে গেলে এইটুকু কষ্ট সহ্য করা আর এমন কি বেশী কথা। সব কষ্টের শেষে কবির কল্পনা বাস্তবে ধরে একজোড়া বাঁকা ভুরু তুলে যখন চাইবেন নিজের প্রতিবিম্বের দিকে—তখন? আশ্চর্য এক খুশীর ঢেউয়ে উথলে উঠবে না কি প্রাণ?

ভুরুর লোম তোলবার আগে সামান্য দুধের সর, ভেসলিন বা ক্রীম আঙুলের ডগায় নিয়ে সমস্ত ভুরুটাতে মাখিয়ে নেবেন বেশ ভাল করে। এতে লোমের গোড়া নরম হয়ে কাজটা সহজ হবে। আর সব সময় মনে রাখতে হবে যে যেখান সেখান থেকে অসমান ভাবে লোম তোলা চলবে না মোটেই। লোম তোলার নিয়ম হলো নিচের দিক থেকে। সারিবদ্ধ ভাবে এক লাইনে দুদিকের দুটি কোণ সরু আর মাঝখানটা সুন্দরভাবে কিছুটা মোটা রেখে লোম তুলে ভুরুতে ধনুকের মতন মনোহর বাঁকা ভাব আনা।

এরপর কেমন করে ভুরু আর চোখ সাজিয়ে গুছিয়ে আপনার স্বাভাবিক রূপকে অপরূপ করে তোলা যাবে সে সম্বন্ধে পরবর্তী প্রসাধন পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হল।

ঠোঁট

এটা খুবই দুঃখের আর আশ্চর্যের বিষয় যে, বেশীরভাগ বাঙালী মেয়ে, তা তিনি যতই আধুনিকা হোন না কেন, কি এক দুর্জ্ঞেয় সঙ্কোচ বা সংস্কারে রূপচর্চার মধ্যে ঠোঁট সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন সবচেয়ে বেশী। ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে তাই প্রায়ই দেখা যায় মনোহর চিত্রল বেশেবাসে গরবিনী চলেছেন, সুন্দর অজন্তা ছাঁদে আছে খোঁপাটি বাঁধা, চোখে কাজল, মুখে সুচারু প্রসাধন, পরনে ম্যাচ করা চোলি-শাড়ি, শুধু পরম উদাসীনতায় অবহেলিত দুটি ভুরু আর দুটি ঠোঁট।

এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে আমরা দেখেছি যে. হয় বেশীরভাগ পরিবারে অভিভাবকেরা আজও আঁকা ভুরু বা ওষ্ঠরঞ্জনীকে অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখেন, নাহলে মেয়েদেরই স্বভাব সঙ্কোচে একটা ধারণা থাকে যে, ওসব করলে বাঙালি গৃহস্থ ঘরের স্বাভাবিক মাধুর্য বা নমনীয় ভাব নষ্ট হয়ে গিয়ে প্রকাশ পায় উগ্র আধুনিকতা বা মেমসাহেবীয়ানা। ধারণাটা কিন্তু দুঃখজনকভাবে ভুল। যেহেতু ভারতীয় সভ্যতাকে পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা বলে দাবী করা হয় আর যে রামায়ণ-মহাভারতকে আমরা ভারতীয় সভ্যতা আর কৃষ্টির চূড়ান্ত যুগ বলে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে ধরে নিই, খৃষ্টপূর্ব সেই যুগে রামায়ণ-মহাভারতের নায়িকারা কিন্তু তাঁদের উচ্ছল যৌবনকে গোপন না করে আরও উদ্ভিন্ন করে তুলতেন আজকালকার নানারকম বক্ষবন্ধনীকে লজ্জা দেওয়া কঠিন কাঁচুলির বন্ধনে। মুখে মাখতেন তাঁরা লোধ্ররেণু, তাম্বুল রাগে রঞ্জিত করতেন বিম্বাধর। কালিদাসের কাব্যে নায়িকা তাই শুধু তন্বী, শ্যামাই নন, সঙ্গে সঙ্গে আছে তার পাকা বিম্ব ফলের মতন টুকটুকে লাল দুটি ঠোঁটের বাহার।

তবে? সুতরাং মাভৈঃ। মেমসাহেব হয়ে ওঠার বিন্দুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচ না করেই এই বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর আর পাঁচটা দেশের মেয়েদের মতন নির্ভয়ে ওষ্ঠরঞ্জনীকে তাঁরা রূপচর্চার একটি অতি অবশ্য

অঙ্গ বলে গণ্য করে নিতে পারেন। নাহলে প্রসাধন যতই সুচারু হোক সবশেষে ঠোঁটদুটি যদি ফ্যাকাশে হয়ে থাকে, তাহলে সেই লালিত্যের অভাবে চেহারায় একটা নমনীয় মাধুর্য আসবে না কিছুতেই। সেই লালিমারই যথেচ্ছ ব্যবহার কিন্তু আবার আনবে আরও কুশ্রীতা।

ঠোঁটে রঙ ব্যবহার তাই অত্যন্ত নিষ্ঠা আর সতর্কতার সঙ্গে করা উচিত। রঙ ব্যবহারের সময় সবচেয়ে আগে জানা উচিত যে সকলকে সব রঙ মানায় না। ত্বকের প্রকৃতির গরমিলের জন্যে একই রঙ একজনের ঠোঁটে যেমন খুলবে আর একজনের কাছে আবার হয়ে উঠবে তেমনি শ্রীহীন আর দৃষ্টিকটু। প্রচুর ধৈর্য আর বিবেচনার সঙ্গে সব আগে তাই নিজের ত্বকের রঙ হিসেব করে ঠোঁটে কি রঙ ঠিকমতন ব্যবহার করলে সুন্দর লাগবে, তা ঠিক করে নিতে হবে।

যাদের রঙ খুব ফরসা তাঁরা বেশ গাঢ় ধরনের রঙ ব্যবহার করবেন। তবে এই রঙ ব্যবহারেরও আবার কঠিন সময় নির্দেশ আছে। অর্থাৎ খুব চড়া রোদে, অফিসে বা বাইরে কাজে যাবার সময় খুব গাঢ় লাল রঙ ব্যবহার করা উচিত নয়। এসময় গোলাপী বা ম্যাজেন্টা রঙ ব্যবহার করা বিধেয়। সন্ধ্যেবেলায় কোনো পার্টিতে বা বিশেষ অনুষ্ঠানে যেতে হলে নির্বিচারে যে কোনো রকম লাল রঙ চলবে।

যাদের রঙ শ্যামলা, তাঁরা দিনের বেলা ম্যাজেন্টা আর সন্ধ্যে বেলায় 'রেড রেড' (Red Red) লাল রঙ লাগাবেন। শ্যামলা রঙের সঙ্গে এই রঙের ভারী সুন্দর একটা সামঞ্জস্য হয়ে মিষ্টি হয়ে উঠবে মুখখানা।

খুব কালো রঙে দিনের বেলায় ব্রোঞ্জ (Bronze) আর সন্ধ্যে বেলায় কোরাল (Coral) রঙ ব্যবহার করলে ত্বকের সঙ্গে ঠোঁটের রঙের বেশ একটা সুন্দর সমতা এনে সুরুচির পরিচয় দেবে। সুন্দরও দেখাবে বেশ।

অনেকের ধারণা আছে যে, ফরসা রঙে সব সময় গাঢ় লিপস্টিক লাগালে খুলবে ভাল। যা শ্যামলা বা কালো রঙে মোটেই চলে না।

ধারণাটা কিন্তু একেবারেই ভুল। হাল্কা লিপষ্টিক ফরসা রঙেই, বিপরীত (contrast) ভাবের ব্যঞ্জনা এনে ভরিয়ে দেয় সুন্দর একটা লালিত্যে। তেমনি বৈপরীত্য আনে কালো ত্বকের ওপর গাঢ় রঙের মাধুর্য। তাই যতই শখ বা ফ্যাশান হোক কালো মেয়েরা ভুলেও কখনো হাল্কা রঙ স্পর্শ করবেন না।

সাধারণভাবে এই নিয়ম প্রযোজ্য হলেও রঙ বিচার করবার সবচেয়ে যা বড় কথা তা হলো একই রঙের আওতায় থেকেই বারবার নানারকম ভাবে পরীক্ষা করে বিশেষ কোন আভাসটি (Shade) ঠিক মানানসই হবে সেটি খুঁজে বার করে নিতে হবে নিজেকেই। রঙ পরীক্ষার সময় হাতের পাতার একেবারে নিচে কোণের দিকে লাগিয়ে দেখে নেবেন। ঠোঁটের রঙের ঠিকমতন এফেক্ট্ ধরা পড়ে ঐখানেই।

ঠোঁটে রঙ কিভাবে লাগাবেন

বেশীরভাগ মেয়েরাই সরাসরি ষ্টিক থেকে ঠোঁটে রঙ লাগান। এ অভ্যেস বেশ কিছুটা সহজসাধ্য হলেও তুলি দিয়ে লাগালে ছাঁদটা অনেক বেশী সুন্দর আর শিল্পিত হয়। তাই হাতে যদি খানিকটা সময় থাকে (প্রসাধন সুন্দর করার জন্যে যা অবশ্যই রাখা উচিত) তাহলে বিয়েবাড়ি, ক্লাব-পার্টি বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে যেতে হলে ঠোঁটে তুলি ব্যবহার করবার চেষ্টা করবেন। খুব হাল্কা ধরনের তুলিতে ষ্টিক থেকে সমানভাবে রঙ লাগিয়ে নিয়ে আগে ঠোঁটের দাগে দাগে একটা রেখা এঁকে নেবেন। ওপরের ঠোঁটের ঠিক মাঝখান থেকে রেখাটা অনেকটা ছবিতে আঁকা ঠোঁটের মতন করে আঁকবার চেষ্টা করবেন। তুল অল্প করে নামিয়ে এনে আগে ডান দিক তারপর বাঁ দিকে রেখা টানবেন। সবশেষে ঠোঁটের হু'টা কোণের রেখা একটু ওপরের দিকে সামান্য ঢেউ খেলিয়ে টান দিয়ে এঁকে নেবেন। এরপর নিচের ঠোঁটে আড়ভাবে তুলি ধরে আস্তে আস্তে ভরাটের কাজের মতন করে রঙ ভরবেন। পাতলা ঠোঁটে পুরো ঠোঁটের রেখায় রেখায় রঙ ভরাবেন। যাঁদের ঠোঁট পুরু ধাঁচের





তাঁরা ঠোঁটের ওপরের দিকটা একটু গাঢ় করে দিয়ে নিচের দিকটা হাল্কা রাখবেন। এতে গাঢ় আর হাল্কা একসঙ্গে মিশে ঠোঁটটা অনেকটা পাতলা দেখাবে।

যাঁরা সোজাসুজি স্টিক ব্যবহার করবেন তাঁরাও তুলির মতন করে প্রথমে ওপরের ঠোঁটের মাঝখান থেকে লাগাতে সুরু করে পরে নিচের দিকে টানবেন। তবে স্টিক দিয়ে ঠোঁটের রেখা বা কোণ আঁকবার চেষ্টা করবেন না। এতে রঙটা ছড়িয়ে গিয়ে বড়ই হাস্যকর দেখাবে।

স্টিক বা তুলি যা দিয়েই রঙ লাগান, সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে রঙটা যেন কোন রকমেই ঠোঁটের রেখার বাইরে চলে না যায় বা বাঁকাচোরা না হয়ে পড়ে। অপটু হাতে প্রসাধনের মতন দৃষ্টিকটু জিনিস বোধহয় আর কিছুই হতে পারেনা। রঙ যদি ঠোঁটের সীমানা ছাড়িয়ে একটুও বাইরে লেগে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে স্পঞ্জ বা পাতলা কাপড়ের টুকরো চেপে চেপে মুছে ফেলবেন।

পার্টি বা সন্ধ্যের আসরে 'লিপ গ্লস' (lip gloss) ব্যবহার করলে ঠোঁটেরউ জ্জ্বলতার সঙ্গে সমস্ত চেহারাটাও বেশ কোমল আর প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। কিন্তু দিনের বেলায় 'লিপ গ্লস' ব্যবহার করবেন না কিছুতেই।

দিনে রাতে যখনই হোক না কেন ঠোঁটের রঙ খুব গাঢ় আর পুরু করে দেবেন। আর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ নিয়ে যে কোম্পানীর জিনিস বেশ ভারী ধরনের সেইটাই বেছে কিনবেন। আর একবার যেটা ব্যবহার করবেন সেটাই আপনার নিজস্ব 'ব্যবহার' (Brand) করে নেবেন। লিপস্টিক ব্যবহারে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, কখনো খুব নামী কোম্পানীর জিনিস (তা দামে একটু বেশী হলেও) ছাড়া নাম না জানা কোম্পানীর জিনিস সস্তা বলে কিনবেন না। কারণ সস্তা করবার জন্যে এইসব হাজার হাজার কোম্পানী যে সব রঙ ব্যবহার করে তা শুধু ঠোঁটের চামড়ার পক্ষেই ক্ষতিকর নয়, ঐ অস্বাস্থ্যকর রঙ খাবারের সঙ্গে পেটে গিয়ে ক্ষতি করতে পারে মারাত্মক রকমের।

ঠোঁটের বিশেষ কতকগুলো পরিচর্যা

অনেকের ধারণা, যেহেতু শীতকালে ঠোঁট ফাটে তাই সেই সময় শুধু ঠোঁটের পরিচর্যা করতে হয়। ধারণাটা কিন্তু একেবারেই ভুল। সুন্দর নমনীয় ঠোঁট পেতে বা রাখতে হলে বারমাসই ঠোঁটের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত।

(১) সব সময় মনে রাখতে হবে যে ঠোঁটের চামড়া খুবই নরম আর স্পর্শকাতর তাই কখনো খুব বেশী গরম বা বরফঠাণ্ডা জিনিস ঠোঁটে বেশীক্ষণ লাগানো উচিত নয়।

(২) ঠোঁট কখনো খুব বেশী শুকনো হতে দেবেন না।

(৩) যাঁদের ঠোঁট স্বভাবতই শুকনো ধরনের তাঁরা যখনই সময় পাবেন ঠোঁটে 'চ্যাপ স্টিক' (Chap Stick) লাগাবার অভ্যেস করবেন। এতে শুকনো ঠোঁট বেশ নরম থাকবে।

(৪) কথা বলতে বলতে কখনো জিভ দিয়ে বারবার ঠোঁট ভেজাবেন না। এতে ঠোঁটের তেলভাব শুকিয়ে গিয়ে ঠোঁট আরও রুক্ষ আর খরখরে হয়ে ওঠে।

(৫) এক আউন্স গোলাপ জলের সঙ্গে সমান পরিমাণ গ্লিসারিন মিশিয়ে লোশন করে রেখে যে কোনো ঋতু নির্বিচারে রাতে শোবার আগে ঠোঁটে কিছুক্ষণ লাগিয়ে রেখে মুছে ফেলবন।

(৬) মুখে ক্রীম লাগাবার সময় ঠোঁটের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন।

(৭) সামান্য দুধের সর খুব ভাল করে ফেটিয়ে হালকা করে লাগায়ে রাখলে যে কোন ঋতুতেই ঠোঁট খুব নরম আর সজীব থাকে।

চুল

বাংলায় একটা কথা আছে, 'কেশেতেই বেশ'। আর কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ কেশের কথাতো আমাদের চোখের ঘুম কেড়েছে কোন সে কৈশোরেই। বরণটি কুঁচ হলে মানুষকে কেমন লাগবে জানিনা। কিন্তু সত্যি সত্যি আষাঢ়ের কালো মেঘের মতন এক পিঠ চুল ছড়িয়ে যদি কেউ এসে দাঁড়ায় সামনে, তাহলে মুগ্ধ বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে থাকবেন না এমন মানুষ কি আছেন? শিশু বয়সের সেই রূপকথার স্বপ্ন চোখে নিয়েই আজকালকার মেয়েদের খুশী থাকতে হয় এক বিঘৎ চুলে নানা ছাঁদের নকল খোঁপা সাজিয়ে।



আজকের জীবন গতির। এই গতির সঙ্গে তাল রেখে মেয়েদের জীবন থেকেও আরাম আর আবেশের ছন্দ সরে গিয়ে বড় কঠিন হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে বাস্তব। আর সেই বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই খরচ হয়ে যাচ্ছে সময়ের একটা বড় অংশ। তাই নিজের জন্যে রাখবার আর যে অবশিষ্ট থাকে না বিশেষ কিছুই।

তবু রাখতেই হবে। নিছক প্রয়োজন ছাড়াও জীবন যে অপেক্ষা করে আরও কিছুর, সে কথাটা ভুললে জীবন থেকে সব রস মাধুর্য ঝরে গিয়ে সামনে ছড়িয়ে থাকবে শুধুই একটা ধূ-ধূ মরুভূমি। তাই রূপচর্চা শব্দটাতেই চমকে ওঠেন মেয়েরা যে সময়ের কথা ভেবে, সেই সময়ের খুব অল্প অংশই সত্যিকার খরচ হয় যদি তাঁরা সুনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান-ভিত্তিক নিয়মকানুনগুলো অনুসরণ করে চলেন নিয়মিত।

আজকাল মেয়েদের যে বেশীর ভাগই বিশেষ চুল হয় না বা হলেও উঠে যায় খুব তাড়াতাড়ি, তার প্রধান কারণ চুলের যথাযথ পরিচর্যা বা তার জ্ঞানের অভাব।

সুন্দর শরীর গড়তে গেলে যেমন চাই নিয়মিত খাদ্য আর ব্যায়াম, সুন্দর এক ঝাড় চুল পেতে গেলে তেমনি তারও চাই নিয়মিত পরিচর্যা।

চুলের খাদ্য তেল। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আজ আমাদের ফ্যাশান হয়েছে শ্যাম্পু ঘষা রুখু রুখু এলো চুল। তাই আজ বেশীর-ভাগ মেয়েই ছেড়েছেন চুলে তেল দেওয়া, কিন্তু তাঁরা জানেন কি যে, যে দেশের অনুকরণে আজ এই ফ্যাশানের স্রোত তাঁরা সেই শ্যাম্পু মাখা সোনালী চুলকে সুস্বাস্থ্যে সুন্দর করে তুলবার জন্যে কত রকমের হেয়ার টনিক আর লোশন ব্যবহার করেন কত পাউণ্ড আর ডলার খরচা করে?

অন্ধ অনুকরণ মানুষকে কখনো সার্থকতা দেয় না। বিশেষত শত শত যোজন দূরে এক দেশের আচার, ব্যবহার, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সবকিছুর মধ্যেই প্রভেদ যেখানে আকাশ-পাতাল।

চুলকে সজীব আর সুন্দর করে বাঁচিয়ে রাখতে তেল ব্যবহার করতেই হবে। রোজ না হলেও সপ্তাহে অন্তত চারদিন। যে সব মেয়েরা বিভিন্ন কাজের তাগিদে দিনের বেলায় সময় পান না তাঁরা রাতে শোবার আগে সপ্তাহে অন্তত চারদিন ভাল করে তেল লাগাবেন। তেল যাই ব্যবহার করুন, নিয়মিত ভাবে সেই একটাই কিন্তু চালিয়ে যাবেন। যখন তখন তেল বদলানো চুলের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। যাঁরা তেলছাড়া চুল রাখতে ভালবাসের তাঁরা তেল মাখার পর শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলতে পারেন।

প্রতিদিন মাথা ভিজিয়ে স্নান করা চুলের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। যাঁদের হাতে সময় আছে তাঁরা নিয়মিত একই সময় চুল ভিজিয়ে স্নান করে চুলটা বেশ ভাল করে মুছে ছেড়ে দেবেন যাতে বাতাস আর রোদ লেগে অল্প সময়ের মধ্যে জল শুকিয়ে যায় বেশ ঝরঝরে হয়ে। চুল শুকিয়ে যাবার পর কিন্তু আর বেশীক্ষণ চুল খুলে রাখবেন না। এতে

পরস্পর ঘষাঘষিতে চুলের ডগাগুলো ভেঙে গিয়ে চুলের বাড় নষ্ট হয়ে যায় আর উজ্জ্বলতা কমে গিয়ে চুল রুগ্ন আর বিবর্ণ দেখায়।

যাঁরা সকালে বাইরে বেরোবেন তাঁরা খুব ভোরে উঠে চুল ভিজিয়ে স্নান করার অভ্যেস করবেন। স্নান শেষে রোদে ঘুরে বা পাখার হাওয়ায় চুল শুকিয়ে বেঁধে ফেলবেন। চুল শুকোতে অনেকে 'হেয়ার ড্রায়ার' (Hair drier) ব্যবহার করেন। বিশেষ প্রয়োজনে কখনো সখনো ব্যবহার করা চললেও নিয়মিত এর ব্যবহার চুলের ক্ষতি করে।

চুল আঁচড়াবার জন্যে চিরুনী ব্যবহার করলেও প্রতিদিন রাতে অন্তত পনেরো মিনিট ব্রাশ দিয়ে চুল ঝাড়বেন। এতে চুলের গোড়ার মুখগুলোতে যে ধুলোবালি পড়ে তা জমে যেতে পারে না, আর মাথার শিরার মধ্যে সুষ্ঠু রক্ত চলাচলের ফলে চুলের সজীবতাও বেড়ে ওঠে দিনে দিনে।

সপ্তাহে অন্তত একদিন মাথা ঘষবেন। এ ব্যাপারে নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী যে কোনো শ্যাম্পু বা সাবান ব্যবহার করতে পারেন তবে কাপড় কাচা সাবান কখনো ব্যবহার করবেন না। এতে যে ক্ষার থাকে তাতে চুলের ক্ষতি হয়। নাম করা কোম্পানীর গায়ে মাখবার খুব নরম কোনো সাবান ব্যবহার করা চলতে পারে। এছাড়া অনেকে রিঠের জল বা বেসন দিয়েও মাথা ঘষে থাকেন। শুধু মাথা ঘষবার জন্যে আলাদা যে সাবান বাজারে পাওয়া যায় তাতেও কাজ হয় বেশ ভাল।

মানুষের শরীরের ত্বকের মতন চুলকেও কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন : (১) শুকনো চুল।
(২) তেলতেলে চুল।
(৩) মিশ্র চুল।
(৪) পাতলা চুল।
(৫) ঘন চুল।

যাঁদের মাথার চামড়া শুকনো তাঁদের চুলের গোড়ায় সহজে ধুলো

ময়লা জমে না তাই তাঁদের পক্ষে দুসপ্তাহ পরে পরে একবার মাথা ঘষলেই যথেষ্ট। কিন্তু যেহেতু তাঁদের মাথার চামড়া শুকনো তাই তাঁরা যদি নিয়মিত মাথায় তেল মাখতে পারেন তাহলে খুবই ভাল হয়। নাহলে সপ্তাহে অন্তত তিন / চারদিন মাখতেই হবে। অত্যধিক শুকনো হবার ফলে চুল যদি একেবারে বিবর্ণ আর শ্রীহীন হয়ে পড়ে তাহলে সপ্তাহে অন্তত একদিন মাথায় দৈ মেখে স্নান করলে ভাল ফল পাবেন। স্নানের আগে দৈটা সমস্ত মাথায় ভাল করে মেখে পাঁচ মিনিট পরে ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে ফেলবেন। বেসন দিয়েও এভাবে মাথা ধুলে ভাল ফলই পাওয়া যায়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি কাঁচা ডিম মাথায় দেওয়া যায়। স্নানের অন্তত আধঘণ্টা আগে একটা গোটা ডিম ভেঙে অল্প জল মিশিয়ে খুব ভাল করে ফেটিয়ে নিয়ে চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘষে ঘষে লাগাবেন। শুকোলে অল্প গরম জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। ইচ্ছে হলে অল্প শ্যাম্পু ব্যবহার করা চলতে পারে। প্রথমটায় অনভ্যাসে হয়তো বেশ খারাপ লাগবে কিন্তু কিছুদিন নিয়মিত দিতে পারলে চুল ওঠা বন্ধ হবে, চুল বাড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হবে চমৎকারভাবে।

মাথার চামড়া যে কোনো রকমেরই হোক, মাথা ঘষবার সময় অন্তত দশ মিনিট ধরে সমস্ত মাথাটা ভাল করে ম্যাসাজ করে নিয়ে তারপর সামান্য গরম জলে মাথা ভিজিয়ে নিতে হবে। এতে চুলের উৎসমুখগুলো খুলে গিয়ে মাথাটা ভালভাবে পরিষ্কার হয় আর ম্যাসাজের ফলে যে ব্যায়াম হয় তাতে চুলের সজীবতা বাড়ে।

যাঁদের মাথার চামড়া তেলতেলে তাঁরা খুব পাতলা ধরনের তেল সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করতে পারেন। সপ্তাহে নিয়মিত অন্তত তিনদিন বেসন দিয়ে মাথা ঘষবেন। তেলতেলে চামড়ায় ধুলোবালি খুব তাড়াতাড়ি জমে যায় তাই প্রতিদিন স্নানের আগে মোটা চিরুনী দিয়ে অন্তত পনেরো মিনিট মাথা আঁচড়াবেন। দিনের বেলা যাঁরা সময় পান না তাঁরা রাতে শোবার আগে এই অভ্যেস করবেন।

যাঁদের মাথার চামড়া মিশ্র তাঁদের ঝামেলা অনেক কম। তাঁরা

মাথার তেল নিজেদের খুশীমতন মাখতে পারেন। সপ্তাহে একদিন মাথা ঘষলেই চলবে, তবে সাধারণভাবেই চুলের সজীবতা বজায় রাখতে গেলে সপ্তাহে অন্তত তিন দিন তেল মাখা উচিত।

যে সব মায়েরা চাইবেন তাঁদের মেয়ের চুল লম্বা হোক তাঁদের মেয়ের জন্মের প্রায় সঙ্গে থেকেই তার চুলের প্রতি যত্ন নিতে হবে। খুব ছোট শিশুর মাথার চুল বারবার আঁচড়াবেন না। দিনে দুবার খুব হাল্কাভাবে ছোট চিরুনী চালিয়ে আঁচড়ালেই শিশুর পক্ষে যথেষ্ট। শিশুর পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত মাথায় শ্যাম্পু বা কোনরকম ক্ষার দেওয়া সাবান ব্যবহার করবেন না। খুব নরম বেবীসোপ বা বেসন দিয়ে মাসে একবার মাথা পরিষ্কার করে ধোবেন। শিশুর ছমাস বয়স থেকে খুব হাল্কা হাতে আস্তে আস্তে তার মাথা ম্যাসাজ করে দেবেন। এতে মাথার শিরায় রক্ত চলাচল ভাল হয়ে চুলের সজীবতা বাড়বে, চুলও বাড়বে খুব তাড়াতাড়ি।

শিশুর প্রথম (জন্মচুল) ফেলবার সময় একমাসের মধ্যে দু / তিনবার ক্ষুর দিয়ে দেবেন। ক্ষুর দেবার সময় চুলের যে দিকে বাড় তার উল্টো মুখে ক্ষুর ফিরিয়ে যাতে কাটা হয় সেই ব্যবস্থা করবেন। এতে চুলের গোড়া খুব শক্ত আর ঘন হবে। যখন থেকে শিশুর চুল (৭/৮ বছর বয়স থেকে লম্বা চুল রাখতে আরম্ভ করলেই ভাল হয়) রাখতে আরম্ভ করবেন, তখন রাতে শোবার সময় নিয়ম করে চুলের গোড়া বেঁধে বিনুনি করে দিতে হবে। পারলে রিবন বা অন্য কোনো কাপড়ের টুকরো দিয়ে বিনুনিটা জড়িয়ে দেবেন। এতে বালিশে ঘষা লেগে চুলের ডগাগুলো ভেঙে যেতে পারে না। এছাড়া সপ্তাহে চারদিন রাতে শোবার সময় আমলা তেল মাথায় বেশ ঘষে ঘষে মেখে সমস্ত রাত রাখলে চুল খুব কালো আর ঘন হবে। (বড়রাও এটি করতে পারেন) বাড়বেও খুব তাড়াতাড়ি। আমলকি আর বয়রার সঙ্গে খানিকটা কালো তিল খাঁটি সরষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিন পনেরো রোদে দিয়ে পরে কাচের কোনো শিশি বা জারে ঢেলে ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দেবেন। নিজের হাতে তৈরী নির্ভেজাল আমলা তেল হবে।

তেলতেলে চামড়ায় ধুলোবালি খুব তাড়াতাড়ি জমে যায়, তাই প্রতিদিন স্নানের আগে মোটা চিরুনী দিয়ে অন্তত পনেরো মিনিট মাথা আঁচড়াবেন। দিনের বেলা যাঁরা সময় পাননা তাঁরা রাতে শোবার সময় আঁচড়াবেন।

মনে রাখার মত কয়েকটি বিশেষ তথ্য

(১) চুল খুব খসখসে আর রুক্ষ হলে খানিকটা ক্যাস্‌টর অয়েল চুলের গোড়ায় ভাল করে ঘষে ঘষে লাগিয়ে কয়েক ঘণ্টা, সম্ভব হলে গোটা রাত রাখবেন।

(২) পাতিলেবু আর ঝুমকো জবার কুঁড়ির রস একসঙ্গে মিশিয়ে রাতে শোবার সময় লাগালে চুল উজ্জ্বল হবে, চুল ওঠাও কমবে।

(৩) সপ্তাহে অন্তত একদিন দৈ দিয়ে মাথা পরিষ্কার করলে খুসকি কমবে, চুলের উজ্জ্বলতাও বাড়বে।

(৪) শ্যাম্পু বা সাবানের বদলে বেসন বা রিঠের জল দিয়ে মাথা ঘষলে চুল নরম আর উজ্জ্বল হবে।

(৫) গোটা একটা ডিম ফেটিয়ে ভাল করে চুলের প্রতিটি গোড়ায় গোড়ায় লাগালে চুল উজ্জ্বল আর মসৃণ হবে, চুল ওঠা বন্ধ হবে সঙ্গে সঙ্গে চুলের বাড়ও হবে বেশ।

যাঁরা খুসকিতে ভোগেন

(১) পরপর কয়েকদিন দৈ দিয়ে মাথা ধুলে উপকার হবে।

(২) স্নানের কিছুক্ষণ আগে জলপাই তেল অল্প গরম করে মাথায় মালিশ করলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

(৩) পাতিলেবুর রস সামান্য ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে স্নানের অন্তত পনেরো মিনিট আগে মাখলে বেশ ভাল ফল পাবেন।

(৪) সবশেষে শুনে আঁতকে উঠবার মতন কথা হলেও ভয় না পেয়ে





যদি কিছুদিন নিয়মিত ছোট পাঞ্জাবী পেঁয়াজের রস মাথায় লাগাতে পারেন তাহলে চুলের উজ্জ্বলতা বাড়বে, চুল ওঠা বন্ধ হবে, খুসকি নষ্ট তো হবেই সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর নতুন চুলে ভরে যাবে সমস্ত মাথা। কয়েকটা কচি পেঁয়াজের রস বের করে আধকাপ মতন হলে মাথার প্রতিটি চুলের গোড়ায় ঘষে ঘষে লাগিয়ে শুকিয়ে ফেলবেন। রাতে শোয়ার সময় লাগাতে পারলে ভাল হয়। সকালে স্নান করে সামান্য গোলাপজল বা ভাল কোনো সেন্ট জলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগিয়ে নিলেই পেঁয়াজের গন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে। শোবার সময় লাগাতে না পারলে স্নানের আধঘন্টা আগে লাগানো যেতে পারে।

চুলের ওপর প্রকৃতির প্রভাব

অনেকেই হয়তো জানেন না যে, শরীরের ওপর যেমন ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে চুলের ওপরেও পড়ে ঠিক তেমনি ভাবেই। গরমের সময় বেশী রোদের তাপ অনবরত চুলে লাগলে চুল বিবর্ণ আর রুক্ষ হয়ে ওঠে। চুলের ডগাও ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই রোদের মধ্যে যাঁদের অনেকক্ষণ সময়ের জন্যে বেরোতে হয় তাঁদের সব সময় ছাতা ব্যবহার করা উচিত। শীতকালেও প্রচণ্ড শীতে চুল উঠে যাবার একটা প্রবণতা থাকে। তার ওপর সেই ঠাণ্ডা অনেকক্ষণ খোলা মাথায় বসলে চুল ওঠা শুরু তো হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে মাথার শিরার রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়ে চুলের মুখ অনেক সময় ফুলে উঠে চুলগুলো কেমন যেন কাঠি কাঠি হয়ে যায়। শীতের সময় সন্ধ্যের দিকে যদি প্রতিদিন বেরোতেই হয়, তাহলে মাথায় গরম বা ঠাণ্ডা স্কার্ফ, নাহলে অন্ততপক্ষে শাড়ির আঁচল ঘোমটার মতন দিয়ে রাখা উচিত। বর্ষাকালে রোদের অভাবে চুল ঠিকমতন শুকোতে না পেরে বা ঠিকমতন বাতাস না পেয়ে চুলের গোড়াগুলো পচে ওঠে। এতে সমস্ত মাথা জুড়ে শুধুমাত্র একটা অপ্রীতিকর গন্ধই যে ছড়িয়ে পড়ে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে চুলও উঠে যেতে আরম্ভ করে খুব তাড়াতাড়ি। বর্ষাকালে যতটা

সম্ভব মাথা না ভিজিয়ে স্নান করবেন। সপ্তাহে যে দিনগুলোতে বেশ রোদ হবে তখন মাথা ভিজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চুল শুকিয়ে ফেলবেন। যাঁরা নানান কাজে বাইরে বেরোন তাঁদের সুযোগ সুবিধে না হলে বরং মাথা না ভিজিয়ে থাকা ভাল কিন্তু কোনো রকমেই ভিজে চুল না শুকিয়ে রাখা উচিত নয়।

ঋতু যাই হোক, প্রতিদিন কিছুক্ষণ খোলা চুলে খানিকটা বেড়াতেই হবে, নাহলে চুলের স্বাভাবিক সজীবতা মরে গিয়ে চুল নিষ্প্রভ আর বিবর্ণ হয়ে উঠবে।

দাঁত

বিজ্ঞাপনের ভাষায় মুক্তোর সারি। কবির কল্পনায় মুক্তো ছড়ানো হাসি। কিন্তু হঠাৎ খুশীর উচ্ছ্বাসে যদি আপনি এক ঝলক হেসে ওঠেন তাহলে সত্যি ঝরঝর করে মুক্তো ঝরবে আপনার মুখ দিয়ে! তা নয়। আসলে যা কিছু সুন্দর তা প্রাকৃতিক হোক বা মানুষেরই হোক, তা দেখেই মানুষ মুগ্ধ হয়। আর এক সুন্দরের সাদৃশ্য মনে পড়িয়ে দেয় আর এক সৌন্দর্যের কথা। তাই সুন্দরভাবে সাজানো এক সারি দাঁত দেখে মনে পড়ে একমুঠো মুক্তোর কথা।

দাঁত ওঠার সুরু থেকেই তাই চেষ্টা করতে হয় সেই সুন্দর সম্পদের অধিকারী হবার। একেবারে কচি বাচ্চাকে প্রতিদিন তেল মাখাবার সময় খুব নরম হাতে মালিশ করে দিতে হবে তার মাড়ি। এতে একদিকে তার তাড়াতাড়ি দাঁত উঠতে যেমন সাহায্য করবে, তেমনি আবার মাড়ি বেশ শক্ত হয়ে দাঁতের স্বাস্থ্যও বজায় থাকবে বহুদিন।

বাচ্চা যতদিন মায়ের দুধ খায় তা যদি তার হয় পেটভরা তাহলে তাকে বাইরের আর কোন খাদ্য দেবার প্রয়োজন হয় না। সেই শিশুকে বাইরে থেকে আর কোনরকম ভিটামিন দেবারও মোটেই প্রয়োজন হয় না। কারণ শিশুর শরীর গড়ে উঠবার মতন সবকিছু উপাদান থাকে মায়ের দুধে। কিন্তু মায়ের দুধ যদি শিশুর প্রয়োজনের থেকে কম হয়, আর সেই কারণে বাইরের খাদ্য তাকে খাওয়াতেই হয়, তাহলে বাইরের দুধের সঙ্গে তাকে প্রতিদিন কয়েক ফোঁটা ভিটামিন দিতে হবে। শিশুর নিজের শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী কোন ভিটামিন তার প্রয়োজন হবে তা অভিজ্ঞ ডাক্তারই বলে দেবেন। ছমাস বয়েস থেকে শিশুকে হাড় আর দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্যে এক চামচ করে কমলালেবুর রস দিতে হবে।

শিশুর দাঁত ওঠার সময় থেকেই যে নিয়মিত তার দাঁত পরিষ্কার করে দিতে হয় একথা বেশীরভাগ মায়েরাই জানেন না। নরম কাপড়ের

টুকরো আঙুলে জড়িয়ে তাতে মধু মাখিয়ে শিশুর জিভ পরিষ্কার করে দেবার রীতি আছে। সেইসঙ্গে দাঁত ওঠার সময় থেকে নিয়মিতভাবে পাতলা কাপড় ঘষে শিশুর দাঁত পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সেই অভ্যেসে শিশু সহজেই ব্রাশ ধরে দাঁত মাজতে আগ্রহী হবে।

আমাদের দেশে আগে নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করার প্রচলন ছিল। আজকের দিনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও ডাক্তারেরা এটি একটি অতি স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা বলে স্বীকার করেন।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সময়ের অভাবে বা সুবিধের জন্যে আজ আমরা অনেক পুরনো অভ্যেস ছেড়ে নতুনে অভ্যস্ত হয়েছি। ভোরে উঠে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা এখন গ্রাম দেশেও চলেছে। শিশুকে অন্তত ছ / সাত বছর বয়স পর্যন্ত ব্রাশ ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়। এসময় মাড়ি আর দাঁত দুই নরম থাকায় ক্রমাগত ব্রাশের চাপে দাঁত ফাঁক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। নিমের দাঁতন, খুব মিহি নুনতেল বা ভাল কোনো মাজন শিশুর পক্ষে ভাল। কিন্তু যা দিয়েই হোক, বয়সের সঙ্গে শিশু যখন সবকিছু খাবার খেতে শেখে তখন খুব ভাল করে দাঁত মাজবার অভ্যেস না করলে সেইসব খাদ্যকণার অবশিষ্টাংশ দাঁতের ফাঁকে পচে গিয়ে ক্রমশ দাঁতের গোড়ায় পচন ধরিয়ে দেয়। এর ফলে আস্তে আস্তে দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়ে যায়। দাঁতে পোকা লাগা বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি এ হচ্ছে তাই। এই পোকা লাগা দাঁতে শুধু যে অসহ্য যন্ত্রণা হয় তাই নয়, এই ক্ষয় বাড়তে বাড়তে দাঁতের একেবারে শেকড়ে গিয়ে পৌঁছয়। ফলে দাঁত পড়ে যায় অসময়ে। সুতরাং রোগমুক্ত সুস্থ এক সারি দাঁত পেতে হলে যত্ন নিতে হবে শিশু বয়স থেকেই।

দাঁত ব্রাশ করবার নিয়ম

দাঁত মাজা বা ব্রাশ করা সম্পর্কে বেশীর ভাগেরই ধারণা থাকে না ঠিকমতন। ব্রাশ কখনো আড়ভাবে বা সোজাভাবে নিয়ে করা উচিত

নয়। এর ফলে ব্রাশের কুচিগুলো ঠিকমতন দাঁতের ফাঁকে ঢুকতে না পারায় খাদ্যকণা থেকে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

দাঁত মাজবার আগে দু / তিনবার মুখে জল দিয়ে কুলকুচি করে নেবেন। তারপর ব্রাশে পেস্ট নিয়ে দাঁতের ওপর ব্রাশটা শুইয়ে ধরে মাজা স্থরু করবেন। যাতে দাঁতের গোড়া থেকে মাড়ি পর্যন্ত ব্রাশটা যেতে পারে। এবার হাতটা ডানদিকে ঘুরিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে নেবেন। এতে দাঁতের সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি পরিষ্কারের কাজও হয়ে যায় একই সময়। ব্রাশটা মাড়ির দিক থেকে দাঁতের দিকে নামিয়ে আনতে হবে। নিচ থেকে মাড়ির দিকে নয়। নিচের দিক থেকে মাড়ির দিকে ব্রাশ চালালে ক্রমাগত ধাক্কা লেগে লেগে মাড়ি সরে যাবার ভয় থাকে। বাইরের সারি এইভাবে মেজে নিয়ে পরে ভেতরের দিকেও মাজতে হবে একইভাবে।

ব্রাশ যেন শক্ত না হয়, কেনবার সময় এটাই প্রথমে দেখতে হবে। বেশী শক্ত ব্রাশ দাঁতের ফাঁকে ঢুকতে না পারায় পরিষ্কারের কাজ ঠিকমতন করতে পারে না। তেমনি আবার বেশী নরম ব্রাশেও কাজ হবে না ঠিকমতন। তাই মাঝারি ধরনের ব্রাশ ব্যবহার সবচেয়ে ভাল। দাঁত মাজার শেষে সামান্য নুনজলে কুলকুচি করলে দাঁতের উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। যাঁদের দাঁতের রঙ হলদে ধরনের তাঁরা সপ্তায় একদিন সামান্য 'পেরোক্সাইড' (Peroxide) দিয়ে দাঁত ঘষলে ভাল ফল পাবেন। এক টুকরো পাতিলেবু খুব সরু করে কেটে তাতে খানিকটা নুন মাখিয়ে অন্তত পাঁচ মিনিট ধরে ভাল করে বাইরে আর ভেতরের দিকে সমান করে ঘষলে হলদে ভাব কমে গিয়ে দাঁতের উজ্জ্বলতা বাড়বে।

এত সব সত্ত্বেও দাঁতের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য বজায় রাখতে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে খাদ্যের ওপর। চারটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ যা আপনার দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তা হলো, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন 'সি' আর ভিটামিন 'ডি'।

ক্যালসিয়াম আর ফসফরাসের জন্যে দিনে অন্তত এক কাপ দুধ

আপনাকে খেতেই হবে। ভাতের পাতে পাতিলেবু খাওয়া আমাদের একটা সাধারণ নিয়ম। এতে প্রয়োজন মেটে ভিটামিন 'সি'-এর। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলতেন যে, "যে দেশে এত প্রচুর পরিমাণে পাতিলেবু জন্মায় সে দেশের মানুষ প্রতিদিন একটা গোটা পাতিলেবু খায় না কেন? একটা লেবু প্রতিদিন নিয়ম করে খেতে পারলে কোনো রোগ ঘেঁষতে পারবে না তার ত্রিসীমানাতেও।" এছাড়া আমলকিতেও ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায় অপর্যাপ্ত। আমাদের দেশে প্রকৃতির আশীর্বাদের মতন ঝরে পড়া রোদ, আলো, হাওয়া আমরা অযাচিতভাবে এত প্রচুর পাই যে তার ওপর আলাদা করে ভিটামিন 'ডি' খাবার আর প্রয়োজনই হয় না।

সবথেকে যা ভয়ের কথা তা হলো, মুক্তোর মতন একসারি সাজানো দাঁতে নানারকম দাগ বা ছোপের রঙ। পান খাওয়া ভারতীয়দের একটা অত্যন্ত প্রিয় শখ। তার জন্যে সারাদিন কত সময় দিয়ে কত রকম জিরি ক'রে সুপুরি কাটা, কত সুগন্ধি মশলা, জরদা আর কিমামের ব্যবস্থা। সেই ভুরভুরে-গন্ধ একখিলি মুখে দিয়ে টসটসে রাঙা দুটি ঠোঁট দেখিয়ে গোটা সংসারটিকে গন্ধে, বর্ণে আমোদিত করে আপনি হয়তো ঘুরলেন সারাদিন! ব্যাপারটা যদি এখানেই শেষ হত তাহলে কথা ছিল না কিছুই। সুন্দরীর তাম্বুল রাগ-রঞ্জিত অধরের প্রশস্তিতে কবিরা তো মুখর হয়েছেন চিরকালই। কিন্তু সেই রঞ্জন যখন গিয়ে স্থিতি হবে আপনার একসারি কুন্দ দন্তে তখন? এর ওপর আবার অনেকের অভ্যেস আছে যখন-তখন দাঁতে মিশি ঘষা। বেশ ভাল কথা। কিন্তু কোনদিন কোনো সভা-অনুষ্ঠানে বা শুধুই প্রিয় পরিজনদের মধ্যে বসে সেই মিশি ঘষা আর পানের ছোপ ধরা দাঁত বার করে যখন আপনি প্রাণ-মাতানো একগাল হাসি হাসবেন, তখন সেই উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে চোখের জল উছলে উঠবে নাতো তাদের?

সুতরাং সুন্দরী হবার জন্যে এতদিন এত কষ্টই যখন করলেন— একটি একটি করে সুন্দর করে তুললেন ভুরুর লোম, গঠন সুন্দর করবার জন্যে দৌড়লেন, লাফালেন, খেলেন—শুলেন ঘড়ির কাঁটা ধরে, তাহলে

সেই সৌন্দর্য আর একটু বিকশিত করতে কষ্ট করতে পারবেন না কি আরও একটুখানি ?

সত্যিকার সুন্দরী অর্থাৎ পাঁচজনের চোখে মনোরমা হয়ে উঠতে সব থেকে বেশী প্রয়োজন সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল এক সারি দাঁত।

অস্ত্র দিয়ে সব সময় যুদ্ধ জয় করা যায় না—কিন্তু সুন্দর একটি মুখের একমুখ মিষ্টি হাসি দিয়ে জয় করা যায় গোটা পৃথিবী। সুন্দর একসারি দাঁত না থাকলে সেই হাসি এমন মনোহারিণী হয়ে উঠবে কেমন করে ?

সুকৌশল বেশবাস বা প্রসাধন আপনার চেহারার অনেক ত্রুটি ঢেকে দিতে পারে, কিন্তু দাঁতের বেলায় তো তার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই দাঁতের শুধু পরিচর্যা করলেই কাজ শেষ হবে না, সেই সৌন্দর্যকে সাজিয়ে রাখতে হবে প্রাত্যহিক চেষ্টায় সুন্দর আর অমলিন করে।

পরক্ষণেই সেই হাত দিয়েই কড়াতে মশলা দিলেন নির্বিকারভাবে। আপনার হয়ত তাতে সময় বাঁচল একটু, কাজটাও সহজসাধ্য বা তাড়াতাড়ি হলো খানিকটা কিন্তু এবার সব কাজের শেষে চেয়ে দেখুন আপনার দুটি হাতের দিকে! চোখদুটো বন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না কি সঙ্গে সঙ্গে? কি দেখছেন? লাউ বা আলু জিরি করে কাটতে গিয়ে বঁটির ধারে আঙুল লেগে লেগে সামনের আঙুল দুটোও যে আপনার জাফরিকাটা হয়ে গেল সেদিকে কি খেয়াল করেছেন এতক্ষণে একবারও? আর সেই জাফরিকাটা নকশার ওপর পড়ল তেল, হলুদ আর লঙ্কার প্রলেপ। নামীদামী শিল্পীর ছবি হলে রসিকজন হয়ত চেয়ে থাকতেন মুগ্ধ চোখে, কিন্তু আপনার হাতের বেলায় সেই শিল্পকর্মের দিকে চেয়ে সভয়ে চোখ বন্ধ করবেন কিন্তু তাঁরাই।

সংসারে কাজকর্মের সময় তাই কতগুলো কথা খেয়াল রাখবেন বিশেষভাবে।

(১) যতদূর সম্ভব সরাসরি হাত দিয়ে কাজ করবার অভ্যেস থেকে দূরে থাকবেন।

(২) বঁটি দিয়ে তরকারি যদি কাটতেই হয় তাহলে বঁটির ধারে আঙুল রেখে তরকারির খোসা ছাড়ানো ইত্যাদি কাজ কখনো করবেন না।

(৩) খুব শক্ত এবড়োখেবড়ো জিনিস বা খুব গরম জিনিস কখনো শুধু হাত দিয়ে ধরবেন না।

(৪) পৃথিবীর আর পাঁচটা সভ্য দেশের মেয়েদের মতন ঘর সংসারের কাজের সময় হাতে দস্তানা পরবার অভ্যেস করবেন যাতে তাড়াতাড়ি কাজের সময় হাতে বা নোখের পাশে তেলকালি বা কোনরকম আঘাতের বিশ্রী দাগ না পড়ে।

হাতের চিত্রল পেলবতার জন্যে

(১) রান্নাঘরের কাজ শেষ করে সামান্য গরম জলে অল্প নুন দিয়ে খুব নরম কোনো সাবানের প্রচুর ফেনা করে তার মধ্যে অনেকক্ষণ

ওঠে না, ঐ দাঁতে খোঁটা অংশ অনেক সময় পেকে গিয়ে খুবই যন্ত্রণা-দায়ক ব্যাপার হয়ে ওঠে। কুসুম-গরম জলে সাবানের অনেকখানি ফেনা করে কিছুক্ষণ হাত নেড়ে নেড়ে ধুয়ে উঠে পড়া চামড়াটা চেপে চেপে দেবেন। পরে খুব নরম কোনো ক্রীম লাগিয়ে রাখবেন হাল্কা করে।

যাঁরা নোখ রঙ করে রাখতে চান তাঁরা সব সময় খেয়াল রাখবেন যে, নোখ কাটার ধরণটা যেন খুবই সুন্দর আর শিল্পিত হয়। ব্লেড দিয়ে কখনো বড় নোখ কাটবার চেষ্টা করবেন না। ক্লিপ দিয়ে পাশগুলো সমান করে সামনের দিকটা একটু oval shape-এর ধাঁচে গোলালো সরু মতন (খুব ছুঁচলো হলে কিন্তু খারাপ দেখাবে) করে তুলতে হবে। তারপর ফাইল দিয়ে সমানভাবে ঘষে নিলেই বেশ মসৃণ হয়ে উঠবে সব দিক। ফাইল ঘষবার সময় কিন্তু সব সময় পাশ থেকে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে ওপর দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে হাল্কা করে। ওপর দিক থেকে নিচে টানবার চেষ্টা করবেন না কোন সময়। এতে নোখ অমসৃণ আর কর্কশ হয়ে ওঠে।

প্রতিদিন ভোরে কুসুম গরম জলে খুব বেশী করে ফেনা করে তাতে হাত ডুবিয়ে ব্রাশ দিয়ে নোখ পরিষ্কার করবেন। তারপর এক চা-চামচ জলপাই তেল সামান্য গরম করে তাতে দশ ফোঁটা পাতিলেবুর রস আর একটু নুন মিশিয়ে কিছুক্ষণ নোখগুলো ডুবিয়ে রেখে আস্তে আস্তে মালিশ করবেন। এতে নোখ বেশ শক্ত আর উজ্জ্বল হবে। হাতে দস্তানা পরবার মতন ভঙ্গি করে প্রত্যেকটা আঙুল টেনে টেনে হাতের উল্টো-সোজা দুপিঠই ক্রিমের সাহায্যে গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করবেন।

সারাদিন কাজকর্মের শেষে বিশ্রাম করবার সময় যে কোনো এমোলিয়েন্ট ক্রিম লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘষে ঘষে মালিশ করবেন। এতে হাত শুধু নরম হবে তাই নয়, নিয়মিত ব্যবহারে ফুলের মতন মসৃণ পেলবতা ফুটে উঠবে দিনে দিনে। এবার হাতের পাতা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা আঙুল ধরে টেনে টেনে দিয়ে আঙুলগুলো ঝেড়ে ফেলবার মতন করে নাড়বেন কয়েকবার।

হাত

আমাদের দেশে, অর্থাৎ ভারতীয় মেয়েরা মুখের প্রসাধনে যতটা যত্ন বা সময় দেন, হাতের প্রতি উদাসীন থাকেন প্রায় ততটাই। যে কোনো পার্টিতে বা কোনো অনুষ্ঠানে একেবারে নিখুঁত আর সুচারু সাজে অপরূপা মেয়েদের হাতের দিকে ভালো করে দেখলেই এর সত্যতা ধরা পড়ে। একবার ভাবুন, আপনি কত ধৈর্য আর যত্নে প্রায় শিল্পীর অধ্যবসায়ে সুন্দর ছাঁদে কেশ বিন্যাস করলেন, চোখ আঁকলেন, ভুরু সাজালেন, ম্যাচ করে পরলেন শাড়ি আর চোলি, পায়ের চটিটিও করলেন একেবারে হাল ফ্যাশানতুরস্ত, কিন্তু আশ্চর্য বেশীরভাগ সময়ই কিন্তু বাদ পড়ে দুটি হাত। কদাচিৎ কেউবা হয়তো একটু সময় দিয়ে নখগুলোতে রঙ ফোটালেন একটু কিন্তু সেখানেই শেষ। হাতের নিয়মিত যত্ন বা পরিচর্যার কথা আমাদের দেশের মেয়েরা যেন চিন্তাই করতে পারেন না আজও। অথচ পৃথিবীর আর যে কোনো দেশেই মেয়েরা হাতের পরিচর্যা রূপচর্চার একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ বা সবচেয়ে বড় কর্তব্য বলে মনে করেন। এবং সেই কর্তব্য যে যথাযথ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কারণ আপনার দুটি হাত শুধু আপনার সম্পদই নয়, সে দুটি আপনার পরিবেশ, আপনার রুচি এমনকি আপনার আর্থিক আর সামাজিক অবস্থারও হিসেব দিতে পারে নির্ভুলভাবে। তাই আপনি যদি শব্দগত অর্থে সত্যিকার সুন্দরী হতে চান—সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দিতে চান একটা নমনীয় মাধুর্যের রেশ তাহলে হাতের যত্ন করুন।

আজকের দিনে নিজের ঘরের অনেক কাজ করে নিতে হয় নিজেকেই। বিশেষ করে রান্না করা। আর আশ্চর্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেয়েরা রান্না করার সময় তাঁদের হাত সম্পর্কে উদাসীন থাকেন একেবারে নিষ্ঠুরভাবে। যেমন তরকারি কাটবার সময় বঁটির ধারে আঙুল ফেলে ফেলে আপনি হয়ত কাজ সারলেন তাড়াতাড়ি।

নেড়ে নেড়ে হাত ধোবেন। এরপর নরম শুকনো তোয়ালে দিয়ে খুব ভাল করে হাত মুছে হাতে লোশন, ক্রীম, দুধের সর বা গ্লিসারিন (এক আউন্স গ্লিসারিনের সঙ্গে এক আউন্স গোলাপ জল আর সমান পরিমাণ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে লোশন ঘরেই করে রেখে দিতে পারেন) লাগিয়ে হাতকে বিশ্রাম দেবেন অন্তত আধঘণ্টা।

(২) সাদা চন্দন ঘষে প্রলেপের মতন করে লাগিয়ে মিনিট পনেরো পরে জল না লাগিয়ে ঝেড়ে ফেলবেন। দিনে দিনে ফোটা ফুলের কমনীয়তায় মুগ্ধ হয়ে উঠবেন আপনি নিজেই। টক দই বা 'ওট মিল' (Oat meal) (ওট মিলটা সামান্য সেদ্ধ করে নিতে হবে) দিয়েও একইভাবে প্রলেপের মতন করে ব্যবহার করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৩) রান্নাঘরের সব কাজের শেষে তেঁতুল গোলা জলে হাত ধুলেও হাতের সমস্ত তেলকালি বা মশলার দাগ উঠে গিয়ে ত্বক নরম আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

(৪) এক চামচ জলপাই তেলের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ শাঁখের গুঁড়ো আর পাতিলেবুর রস মিশিয়ে প্রলেপের মতন করে অন্তত আধঘণ্টা লাগিয়ে রেখে পরে নরম কাপড়ের টুকরো দিয়ে আস্তে আস্তে তুলে ফেলবেন।

(৫) হাতের খোলা অংশ (ঘাড়ে, গলায় আর পিঠেতেও প্রযোজ্য) রোদে পুড়ে কালো হয়ে উঠলে এক চামচ ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে আধখানা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে লাগালে কালো অংশ দিনে দিনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হাত ধোবার সময় বিশেষভাবে খেয়াল করে নোখের পাশের অংশগুলোও খুব ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে ভুলবেন না। অনেক সময় নোখের পাশের চামড়ার একাংশ বা দুদিকই একটু উঠে পড়ে। অনেকে অবলীলায় সেটুকু দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেন। এর থেকে খারাপ অভ্যেস বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না। এতে শুধু নোখের পাশগুলো কালো আর এবড়োখেবড়ো হয়ে গিয়ে অসুন্দরই হয়ে

প্রচুর পরিমাণে দুধ, ফলের রস আর সবুজ শাকসব্জি কাঁচা খেতে পারলে নোখ শক্ত হয় আর উজ্জ্বলতাও বাড়ে। যাঁদের নোখ বেশী নরম আর অল্পতে ভেঙে যায় তাঁরা এক চামচ জিলাটিন (gelatine) এক কাপ ফলের রস বা জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে দু / তিন মাসের মধ্যে ফল পাবেন।

পায়ের নোখের বেলাতেও একই পরিচর্যা প্রযোজ্য। তবে পায়ের ওপর শরীরের ভারটা সারাদিন থাকার ফলে পায়ের প্রতি আরও বেশী সতর্ক থাকতে হয়। এ সম্বন্ধে পায়ের পরিচ্ছেদে আলোচনা রইল।

নোখে রঙ ব্যবহার করবার সময়ও বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। সাধারণভাবে লাল রঙটাই বেছে নেন বেশীরভাগ মেয়ে। তা কিন্তু করা উচিত নয়। লিপস্টিক ব্যবহারের মতন নোখের বেলাতেও দিনে রাতে আলাদা আলাদা রঙ ব্যবহার করা উচিত। সকাল বা দুপুরে অফিস বা যে কোনো বিশেষ কাজে যাবার সময় স্বাভাবিক নোখের রঙ, সোনালী বা উজ্জ্বল সাদা ব্যবহার করা উচিত। রাত্রে গাঢ় গোলাপী, গভীর লাল (নানারকম) ম্যাজেন্টা বেশ ভাল লাগে। যখন যে রঙই ব্যবহার করা হোক না কেন প্রতিটি রঙের যে বিভিন্ন আভা (Shade) আছে সেই কথাটা মনে রেখে আপনার পছন্দ আর ত্বকের রঙ অনুযায়ী তার থেকেই ঠিকমতন রঙটি বেছে নিতে হবে আপনাকে।

যাঁদের রঙ বেশ ফরসা তাঁরা দিনের বেলা সাদা বা উজ্জ্বল গোলাপী আর রাতে উজ্জ্বল সিঁদুর লাল রঙ ব্যবহার করবেন। শ্যামলা মেয়ে দিনের বেলায় ব্যবহার করবেন, স্বাভাবিক নোখের রঙ বা খুব হাল্কা সোনালী, রাতে কালচে লাল। যাঁদের রঙ বেশ কালো তাঁরা কোনো সময়েই সাদা বা গোলাপী রঙ ব্যবহার করবেন না। এতে তাঁদের হাত আরও কালো দেখাবে। দিনের বেলায় তাঁরা সব সময় স্বাভাবিক নোখের রঙ আর রাতে ম্যাজেন্টা ব্যবহার করবেন।

যত তাড়াতাড়ি বা যতই ব্যস্ততা থাকুক, কোনো সময় একটা

রঙের ওপর আর একটা রঙের প্রলেপ চাপাবেন না কিছুতেই। একটা সরু কাঠির আগায় একটু তুলো রিমুভারে ভিজিয়ে এক একটা নোখ ধরে রঙ তুলুন। সবগুলো হয়ে গেলে কুসুম গরম জলে সামান্য ফটকিরি ফেলে নোখের ডগাগুলো দু/তিন মিনিট নাড়াচাড়া করে শুকনো তোয়ালে চেপে চেপে শুকনো করুন। পাঁচ মিনিট খোলা হাওয়া লাগতে দিন। তারপর আবার নতুন রঙ লাগান। তাড়াতাড়ির সময় শুধু রিমুভার দিয়ে পুরনো রঙটা উঠিয়ে ফেলে নতুন রঙ করবেন। রঙ করবার সময় খেয়াল রাখবেন যেন তুলিতে প্রয়োজনের বেশী রঙ না উঠে আসে। শিশির মুখে তুলিটা সামান্য চেপে ধরে খানিকটা রঙ নিঙড়ে নিয়ে তবেই নোখে লাগাবেন। লাগাবার সময় দুপাশে নোখের ধরন অনুযায়ী আগে একটা রেখা টেনে নেবেন। তার পর ভরাট করে তুলবেন নিচের দিক থেকে ওপরে। একবার টানে শেষ করবেন না। দুবার প্রলেপ দেবেন। একটা হাত একবার হয়ে গেলে অন্য হাতে দিয়ে নিয়ে তবেই আবার প্রথম হাতটাতে দেবেন। সব সময় খেয়াল রাখবেন তুলিটা যেন কোন সময়ই লাইনের বাইরে চলে গিয়ে নোখের পাশে রঙ না ছড়ায়। তবু যদি একান্ত চলে যায়ই তবে orange stick-এর আগায় অল্প তুলো জড়িয়ে remover-এর সাহায্যে তুলে ফেলুন।

তবে এত সত্ত্বেও সত্যিকার সৌন্দর্য আর পাঁচজনের মুগ্ধ দৃষ্টি জাগিয়ে তোলার সবচেয়ে বড় উপায় সমস্ত শরীরটা জুড়ে আপনার একটা নিজস্ব ভঙ্গির প্রকাশ। মনোরম একটা চিত্রলতা নিজের মাধুর্যে যা আপনাকে সুন্দর করে তুলবে অন্য পাঁচটি চোখে। তাই বসে বা দাঁড়িয়ে যে ভাবেই হোক হাত রাখার ভঙ্গিটি আপনার সব সময় যেন কোন শিল্পীর আঁকা ছবির মতন মনোরম হয়। দাঁড়াতে হলে হাতদুটি কখনই শরীরের দুপাশে হাতির শুঁড়ের মতন ঝুলিয়ে দেবেন না। বড় দৃষ্টিকটু আর স্থূল মনে হয় এ ভঙ্গিটি। দাঁড়িয়ে কথা বলতে হলে বাঁ হাতের চেটোর ওপর হাল্কাভাবে ডান হাতের আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করার ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করবেন। এতে

আপনার সুন্দর সাজানো আঙুলগুলোই শুধু দেখানো হবে না, বেশ একটা মধুর কমনীয় ভঙ্গিও ফুটে উঠবে সেই সঙ্গে।

চেয়ারে বসলে চেয়ারের হাতলে বাঁহাতের কনুইটা রেখে আঙুলগুলো চিবুকের তলা দিয়ে ঝুলিয়ে দেবেন সুন্দর একটা ছবি ছবি ভঙ্গিতে। ডানহাতটা ডানদিকের হাতলের ওপর সাজিয়ে রাখবেন আলগোছে। যখন যেখানে যে প্রয়োজনেই যাবেন আপনার চলা, বলা, বসা, দাঁড়ানো প্রতিটি গতিভঙ্গি যেন কোনো শিল্পীর আঁকা ছবির মতন মনোরম হয়ে ওঠে।

পরিচিত জনদের কাছে একান্ত আকাঙ্ক্ষিত—সত্যিকার সুন্দরী হয়ে ওঠার এই হলো মূলমন্ত্র।

পদপল্লব

একটা ছবি যেন হেঁটে আসছে ফ্রেম থেকে নেমে। কালো বড় বড় ছুটো চোখের কোলে কাজল টানা। একেবারে আনকোরা ধরনের চুলের ধাঁচ, মাস্‌কারা, টিপ—চলনে, বলনে নিজস্ব প্রসাধন ভঙ্গিতে অনুপমা। জোড়া জোড়া মুগ্ধ চোখে শুধু নিঃশব্দ প্রশস্তি। সেই ছবিটি যখন এসে দাঁড়াবে ঘরের মাঝখানে, তখন সবগুলি মুগ্ধ চোখ তার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখতে যে আগ্রহী হয়ে উঠবে সহজ কৌতূহলে, এই কথাটাই ভুলে যান আমাদের দেশের বেশীরভাগ সুন্দরী। তাঁদের হয়তো ধারণা যে, পায়ের দিকে কে আর অত বিশেষ করে খেয়াল করবে? এ ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল। সুন্দরী নারীর শুধু সুন্দর মুখই নয় সুন্দর ছুটি পদপল্লবও চোখকে টানে সমানভাবে। কাব্যে, সাহিত্যে এর প্রমাণ তো আমরা পেয়ে থাকি পদে পদে। তাই রূপচর্চা মানে শুধু মুখের প্রসাধনই নয়, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে আপনার পায়ের যত্ন আর পরিচর্যাও করতে হবে সমানভাবে।

পায়ের পরিচর্যার জন্যে যে জিনিসগুলো রাখতে হবে হাতের কাছেঃ

(১) পা ঘষা ব্রাশ
(২) ঝামা
(৩) স্পঞ্জ বা ছোবড়া
(৪) নারকোল বা জলপাই তেল
(৫) ক্লিনসিং মিল্‌ক
(৬) রাধামাটি বা চন্দনমাটি
(৭) ট্যালকম পাউডার
(৮) গ্লিসারিন
(৯) গোলাপজল
(১০) নরম তোয়ালে
(১১) তুলো

প্রতিদিন যে কোনো সময় কুসুম গরম জলে বেশ বেশী সাবানের ফেনা করে পা ডুবিয়ে রাখবেন পাঁচ/সাত মিনিট। পরে ব্রাশ দিয়ে নোখের কোণ, গোড়ালি আর পায়ের পাশগুলো পরিষ্কার করবেন ঘষে ঘষে। এরপর প্রচুর ঠাণ্ডাজল ঢেলে ঢেলে পা ধোবেন বেশ খানিকক্ষণ ধরে।

স্নানের আগে নারকোল বা জলপাই তেল পায়ের পাতায়, গোড়ালি আর নোখে মাখবেন। পনেরো মিনিট পরে স্নান করবেন সাবান ঘষে। নোখের কোণা কোনো সময় মাংসর মধ্যে যাতে বসে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। যাঁরা পায়ের নোখও বড় রাখতে পছন্দ করেন তাঁরা নোখের পাশগুলো গোল করে কেটে সামনের দিকটা বড় রাখবেন। এতে নোখগুলো দেখতেও যেমন শোভন হবে তেমনি নোখের কোণগুলো মাংসর মধ্যে বসে যাবার ভয়ও থাকবে না।

স্নানের সময় স্পঞ্জ বা ছোবড়ায় বেশী করে সাবানের ফেনা করে নিয়ে আঙুলের মাঝখানের অংশ, গোড়ালি, নোখের ডগা ভাল করে পরিষ্কার করবেন। সবশেষে ঝামা ধরে একটু চেপে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত পাটা ঘষে নেবেন। এ অভ্যেস নিয়মিত করলে পায়ে যন্ত্রণাদায়ক কড়া পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

স্নান শেষে পায়ে যাতে একটু জল না থাকে সেভাবে নরম তোয়ালে দিয়ে একেবারে শুকনো করে পা মুছবেন। এরপর একখণ্ড তুলো যে কোনো লোশনে ভিজিয়ে সমস্ত পা-টি জুড়ে সমান করে লাগাবেন। আগেও যা বলা হয়েছে, অর্থাৎ এক আউন্স গ্লিসারিনের সঙ্গে এক আউন্স গোলাপজল আর সমান পরিমাণ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে লোশনটা বাড়িতেই করে নিতে পারেন।

শুধু দৌড়ন নয়, অনেকখানি পথ হাঁটলে বা অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও পা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে পায়ের ডিমে ব্যথা বা কখনো কখনো শিরায় টান পড়ে। ফুটবাথ নিলে এর উপশম হয়। সমস্ত পায়ের পাতা ডুবিয়ে রাখা সম্ভব এরকম তুটো পাত্রে একটাতে গরম অন্যটাতে ঠাণ্ডা জল নিয়ে পর্যায়ক্রমে একবার গরম-জলে পা ডুবিয়ে একটু নাড়ানাড়ি করে পরক্ষণেই আবার ঠাণ্ডা জলে

নাড়ুন। মিনিট দশেক এরকম একবার গরম আর একবার ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে নরম শুকনো তোয়ালে দিয়ে একেবারে শুকনো (আঙুলের পাশগুলো যেন বাদ না যায়) করে মুছে ফেলুন। শীতকাল হলে গরম মোজা আর গরমকালে ঠাণ্ডা চাদর দিয়ে সমস্ত পা-টা ভাল করে মুড়ে ফেলুন। রাতে শুতে যাবার আগেই ফুটবাথ নেওয়াটা প্রশস্ত। গরমজলে এক টেবিল চামচ সোডিবাই-কার্ব বা সাধারণ নুন মিশিয়ে নিতে পারলে খুবই ভাল হয়।

পায়ের নোখ সজীব আর শক্ত করবার জন্যে জলপাই তেল অল্প গরম করে তাতে সামান্য পরিমাণ নুন মিশিয়ে মালিশ করলে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সামান্য কারণেই যাঁদের পায়ের ডিমে ব্যথা হয় তাঁরা সরষে বা তারপিন তেল গরম করে বেশ গরম অবস্থাতেই পায়ের আঙুল থেকে হাঁটু পর্যন্ত জোরে জোরে মালিশ করবেন। মালিশের সময় হাতটা ঘুরিয়ে ডানদিক থেকে বাঁদিকে গোল করে নেবেন। প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা মালিশ করবেন। মালিশের পর অন্তত আধঘণ্টা পায়ের বিশ্রাম দেবেন। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে কয়েকটা খুব নরম বালিশ পরপর রেখে উঁচু করে নিয়ে তার ওপর পাদুটো তুলে দেবেন।

রাতে শোবার সময় প্রতিদিন নিয়মিত কোনো ভাল ক্রিম পায়ে (নোখ আর আঙুলের পাশগুলোতেও) লাগিয়ে শুলে পায়ের চামড়া নরম আর সজীব হয়ে ওঠে। বাড়িতে তৈরী গ্লিসারিনের যে লোশনের কথা বলা হয়েছে তাও রাতে শোবার সময় ব্যবহার করলে ভাল হয়।

এই তো গেল সাধারণভাবে পায়ের পরিচর্যার কথা। এখন পায়ের যে কতগুলো অত্যন্ত অস্বস্তিকর আর যন্ত্রণাদায়ক রোগ আছে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

পা ফাটা ঃ শীতের শুরু হতে না হতেই অনেকের পায়ের গোড়ালিতে ফাটল ধরে। তাতে পা শুধু শ্রীহীন বা কদর্যই হয়ে ওঠে না, অনেক সময় এই ফাটায় বীভৎস ক্ষত সৃষ্টি হয়ে খুবই দুঃসহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। প্রকৃতির প্রতিটি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের

শরীরেও কিছু কিছু পরিবর্তন হয় এই কথা মনে রেখে প্রথম থেকেই তার জন্যে সতর্ক প্রহরায় থাকা উচিত। যাঁদের পা ফাটার ধাত আছে, অর্থাৎ প্রতি শীতেই যাঁরা পা ফাটায় কষ্ট পেয়ে থাকেন তাঁদের শীত পড়বার আগে থেকেই এ বিষয়ে যত্ন নিতে হবে। শীত পড়বার কিছু আগে হেমন্তবেলার সুরু থেকেই প্রত্যেকদিন স্নানের আগে নারকোল বা জলপাই তেল পায়ের গোড়ালিতে মাখতে হবে বেশ ভাল করে। দিনে বা রাতে বিশ্রামের সময় গ্লিসারিন গোলাপজলের লোশন নিয়মিত ব্যবহার করলে পা ফাটার সম্ভাবনা থাকে না একেবারেই।

পা ফাটলে সহ্য হওয়ার মতন গরম জলে (জলটা একটু গরম মতন হলেই ভাল হয়) সামান্য বোরাক্স্ বা নুন মিশিয়ে জলটা গরম থাকা পর্যন্ত পা ডুবিয়ে রাখবেন। পরে শুকনো নরম তোয়ালে দিয়ে খুব শুকনো করে মুছে যে কোনো রকম মলম (বাজারে অনেক রকম পাওয়া যায়) লাগালে উপকার পাবেন।

কাঁচা হলুদ বাটার সঙ্গে সামান্য গ্লিসারিন মিশিয়ে প্রলেপের মতন করে লাগালেও উপকার পাওয়া যায়।

পা বেশী ফাটলে যতদিন পর্যন্ত না সারে ততদিন রাতে শোবার সময় গরম জলে প্রচুর সাবানের ফেনা করে অল্প নুন মিশিয়ে পা-টা নেড়ে নেড়ে ধোবেন। তারপর কুসুম গরম জলে ভাল করে ধুয়ে ফেলে গ্লিসারিন লাগিয়ে গরম মোজা পরে শোবেন।

আঙুল ফোলা ঃ বেশী শীতের বা পাহাড়ী জায়গায় অনেকের পায়ের আঙুল লাল হয়ে ফুলে ওঠে। চুলকোতে থাকে প্রচণ্ডভাবে। এক্ষেত্রেও গরম জলে নুন বা বোরাক্সের ফুটবাথ নিয়ে (বোরাক্স হলেই বেশী ভাল হয়) একেবারে শুকনো করে মুছে যে কোনো মলম (অবশ্যই নামকরা কোম্পানীর) আঙুলের সবদিকে বেশ ভাল করে লাগিয়ে গরম মোজা পরে শোবেন। এই ধরনের ফোলা হলে পায়ে কোনরকমেই যাতে ঠাণ্ডা জল না লাগে সেদিকে বিশেষ সতর্ক হবেন। সব সময় মোজা আর চটি পরে থাকলে উপকার বা আরাম পাবেন।

নোখকুনি ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, নোখ কাটার দোষে অনেক সময় নোখের কোণ মাংসর মধ্যে ঢুকে গিয়ে পাশগুলো ফুলে উঠে পেকে যায়। এটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। অল্প অল্প হওয়ামাত্র ফুটন্ত গরম জলে বোরাক্স্ দিয়ে সেঁক দেবেন দিনে অন্তত তিন/চারবার। পরে যে কোনো ঠাণ্ডা মলম লাগিয়ে নেবেন। দু/একদিনের মধ্যে উপকার না পেলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

আজকাল অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে উঁচু হিলের জুতো পরা খুবই চল হয়েছে। কিন্তু একটা কথা সব সময় মনে রাখা উচিত যে, যে কোনো বয়সেই যে কোনো রকম হিল পরা চলে না। ১১/১২ বছর বয়স থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত পায়ের গড়ন এমন নরম থাকে যে, সে সময় খুব উঁচু হিলের জুতো পরলে পায়ের ডিম আর শিরার ওপর অহেতুক চাপ পড়ে পায়ের গড়ন নষ্ট হয়ে যায় বা চলার ভঙ্গিটাই খারাপ হয়ে যায় অনেক সময়। তাই এই বয়সের মেয়েরা শুধু ফ্যাশান হয়েছে বলেই যেন এ ধরনের জুতো পরবার চেষ্টা করবেন না।

অনেকের ধারণা উঁচু হিলের জুতো পরলে চলার ভঙ্গি সুন্দর হয়। কথাটা আংশিক ঠিক হলেও সুন্দর ছন্দে হাঁটাটা একেবারেই অভ্যেস সাপেক্ষ। সবচেয়ে মনে রাখবার মতন কথা হলো এই যে, হিল যেমনই পরুন সেটাই ধরে রাখতে হবে মোটামুটিভাবে। একবার উঁচু আর একবার একেবারে সমান হিলের জুতো পরার ব্যবস্থা রাখবেন না কিছুতেই। উঁচু হিল থেকে সমান হিলে যদি নামিয়ে আনতেই হয় তাহলে তা ক্রমশ অভ্যেস করতে হবে।

আর একটা বিশেষ মনোযোগের ব্যাপার হলো জুতোর মাপ। জুতো কেনবার সময় পায়ের গড়নের সঙ্গে সমতা রেখে কিনতে হবে। যাঁদের পা একটু চওড়া ধরনের অথবা আঙুলগুলো ছড়ানো তাঁরা পাশের দিকে চাপা সরু ধরনের জুতো নেবেন। পা যাঁদের সহজাতই সুগঠিত তাঁরা ইচ্ছেমতন যে কোনো ধরনের জুতো পরতে পারেন। তবে পায়ের মাপের থেকে বেশী আঁট বা ঢিলে জুতো কখনো পরবেন না। বেশী আঁট জুতোয় পায়ের পাতার ওপর অনবরত ঘষা লাগায় সেখানকার চামড়া

কেটে যেতে বা ফুলে লাল দাগ হয়ে যেতে পারে। পায়ের মাপের চেয়ে বড় জুতো পরলে যে দৃঢ়ভঙ্গিতে চললে চলার ভঙ্গিটা বেশ সুঠাম হয় সেটা নষ্ট হয়ে গিয়ে কেমন যেন শিথিলতা এসে পড়ে। যার ছাপ অত্যন্ত বিসদৃশ হয়ে ফুটে ওঠে সমস্ত শরীরটা জুড়েই। শ্রোণীভারে শ্লথ গতি কালিদাসের কাব্যে যতই স্থান পাক, আজকের দিনে পুরুষের পাশে সমান গৌরবে এগিয়ে চলেছে যে নারী তাকে চলতে হবে ঋজু ভঙ্গিতে, শক্ত পায়ে। প্রসাধন নারীর স্বাভাবিক রূপকে আরো মনোহারিণী করে তোলে, কিন্তু তাই বলে প্রসাধন মানেই যে ললিত-লবঙ্গলতা হয়ে এলিয়ে পড়া নয়, সেকথা আজকের দিনে মনে রাখতে হবে সব থেকে আগে।

যাঁরা বাড়িতেও চটি পরে থাকতে অভ্যস্ত তাঁরা দিনে অন্তত কিছুক্ষণ সময় খালি পায়ে থেকে রোদ হাওয়া আর মাটির স্পর্শ নেবেন। নাহলে অনবরত চটির ঘষায় আর রোদ হাওয়া না লেগে পায়ের চামড়া রুক্ষ হয়ে ওঠে দিনে দিনে। অনেক সময় ছোট ছোট ফুসকুরি, চুলকুনি বা ঘা পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে এ থেকে।

পায়ের ত্বকের সজীবতা বা পেলবতা বাড়াতে হলে এক চামচ জলপাই-তেল সামান্য গরম করে তাতে এক চামচ লেবুর রস আর সামান্য নুন দিয়ে প্রতিদিন মালিশ করবেন। নোখের উজ্জ্বলতা বাড়াতে হলেও নিয়মিত এক চামচ জলপাই-তেলের সঙ্গে অল্প নুন দিয়ে সামান্য গরম করে মালিশ করবেন।

আগেই যা বলা হয়েছে, আমাদের দেশের মেয়েদের বেশীরভাগেরই ধারণা আছে যে, পায়ের দিকে কে আর অত দেখছে। সেইজন্যে পরিচর্যা তো বটেই প্রসাধনেও পায়ের দিকে খেয়াল করেন না বেশীর-ভাগই। এ ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল। নানারকম সাজসজ্জায় সুন্দর হয়ে ওঠা একটি শরীরে—চোখ জুড়নো শাড়ির অনেক দামী পাড়ের ঝলকানির পাশ দিয়ে যদি বেরিয়ে আসে ফাটা, নোংরা, কালো কালো নোখে ভরা কদর্য দুটি চরণশ্রী (?)—তখন ভাবতে পারেন অবস্থাটা ? বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাই কিন্তু ঘটে থাকে। আপনার

বেলাতেও বেচারা দর্শককুলকে যাতে এমন কৌতুককর একটি নাটক দেখতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

হাতের প্রসাধনের মতন পায়ের প্রসাধনও সমান যত্ন নিয়ে করবেন। শাড়ির রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে হাতের নোখে যখন যে রঙ করবেন সেই রঙ দেবেন পায়ের নোখেও। পুরনো রঙ কোথাও উঠে গেলে আবার তা নতুন করে দিয়ে নেবেন। শাড়ির সঙ্গে রঙের সাদৃশ্য এনে চটি পরবেন (শুনেই ভয় পেয়ে যাবার কোনো কারণ নেই। লাল, কালো আর পাঁচমেশালী, এই তিনরকম রঙের তিনজোড়া চটি রাখলেই সব রঙের শাড়ির সঙ্গে প্রয়োজন মতন মানান করে পরা চলবে)। একেবারে অসঙ্গতভাবে উল্টো-পাল্টা শাড়ি আর চটি পরলে বড়ই দৃষ্টিকটু হয়ে পড়ে সমস্তটা।

প্রসাধন

কারুর রূপে মুগ্ধ হলে চলতিভাবে আমরা বলে উঠি, আহা কি সুন্দর ছবির মতন চেহারা। কিন্তু ঠিক ছবির মতন সত্যি তো আর কারুর রূপ হতে পারে না! আসলে সুন্দর যা কিছু দেখি তার চিত্রময়তা আমাদের মুগ্ধ করে। তাই অবচেতন মনে তুলনা আসে হঠাৎ দেখা কোনো একটি সুন্দর সাদৃশ্যের ছবি।



এই ছবির মতন সুন্দর মোহ সৃষ্টি করাটা নির্ভর করে তিনটি বিশেষ জ্ঞানের ওপর। আগেই বলা হয়েছে যে, গায়ের রঙ আপনার কালো না পাকা সোনার মতন সেই বিচারের থেকেও বড় বিচার, আপনার চলায়-ফেরায়, বসায়-দাঁড়ানোয় এমনকি কথা বলবার ভঙ্গিটিতেও সুন্দর একটা শিল্পিত ছবি ফুটে ওঠে কিনা। এর সঙ্গে আছে আপনার শরীরের প্রতিটি অংশের সুষ্ঠু পরিচর্যা, যা আপনার স্বাভাবিক রূপ-যৌবনকে আরও রমণীয় করে ধরে রাখতে সাহায্য করে। আর সব শেষের কথা প্রসাধন। অর্থাৎ আপনার একান্ত যত্নে আর পরিচর্যায় ভরে ওঠা রূপ-যৌবন অপরূপ হয়ে উঠবে প্রসাধনের সুষম লালিত্যে।

প্রসাধন বলতে কিন্তু আমাদের সাধারণ ধারণা, কিছুটা পাউডার, ক্রিম আর রুজ-লিপস্টিকের ব্যবহার। কিন্তু প্রসাধন মানে সত্যিকারে তা নয়। কোথায়, কতটুকু আর কি ব্যবহার করলে মুখের ছোটখাটো ত্রুটি ঢাকা পড়ে স্বাভাবিক রূপ আরও অপরূপ হয়ে উঠবে তা ঠিক মতন জেনে নিয়ে শিল্পীর অধ্যবসায়ে নিজেকে সাজিয়ে তোলার নাম প্রসাধন।

প্রসাধন ব্যাপারে প্রথম আর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পাঠ হলো প্রসাধন-দ্রব্য নির্বাচন।

(১) কখনো কোনো কারণেই কম দামী বা অখ্যাত অবজ্ঞাত কোনো কোম্পানীর জিনিস ব্যবহার করবেন না। এই কমদামী অচেনা কোম্পানীগুলো বেশীরভাগই অতি লাভের আশায় তাদের জিনিসে খুবই নিকৃষ্ট মানের কেমিক্যাল ব্যবহার করেন। ফলে জিনিসগুলো দামে হয়তো শস্তা হয় কিন্তু মানুষের ত্বক বা শরীরের পক্ষে যে সেগুলো কি ভয়ানক ক্ষতিকারক আর মারাত্মক, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। সুতরাং সব সময় দামী আর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বাজারে যাদের নিজস্ব একটা ঐতিহ্য আর সুনাম আছে একমাত্র এই রকম কোম্পানীর জিনিস দাম একটু বেশী হলেও ব্যবহার করবেন।

(২) যে জিনিসগুলো আপনার বেশ পছন্দ আর সুবিধেমতন বলে মনে হবে সেগুলোই বরাবর ব্যবহার করবার চেষ্টা করবেন। বারবার বদল করলে নিজস্ব একটা অভ্যেস গড়ে উঠতে পারে না। ত্বকের পক্ষেও এইরকম ঘন ঘন পরিবর্তন ক্ষতিকারক হতে পারে।

(৩) প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো হাতের কাছে বেশ পরিষ্কার শুকনো অথচ ঠাণ্ডা জায়গায় গুছিয়ে রেখে দেবেন।

(৪) তুলি, ব্রাশ, চিরুনী, স্পঞ্জ বা টিস্যু যেন সবসময় খুবই পরিষ্কার থাকে।

(৫) বেশীদিন হয়ে গেলে, তা সে যত দামী প্রসাধন-জিনিসই হোক, ফেলে দেওয়া উচিত। অনেক কোম্পানীর জিনিসে ব্যবহারের বা তৈরীর সময় নির্দেশ থাকে। সতর্কভাবে সে নির্দেশ মেনে চলবেন। শুকিয়ে বা শক্ত হয়ে ওঠা জিনিসের প্রতি কোনমতেই কিছু দুর্বলতা রাখবেন না। কারণ এরকম জিনিস ব্যবহারের ফল খুবই খারাপ হতে পারে।

(৬) বয়স আর সময়োপযোগী প্রসাধন। শখ আর ইচ্ছে আছে বলেই আপনি যেমন ইচ্ছে প্রসাধন করবেন এ কখনো হতে পারে না। অর্থাৎ প্রসাধন করতে বসে সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে

আপনার বয়স, সামাজিক পরিবেশ, অনুষ্ঠানের প্রকৃতি আর সময়ের কথা। বয়সটা যদি আপনার ষোলো থেকে আঠাশের মধ্যে হয় তাহলে যে প্রসাধন চলবে তিরিশে তা চলবে না। আর চল্লিশের ঘরের পরে প্রসাধন তো প্রচুর বিচার আর বিবেচনা সাপেক্ষ। সব সময় মনে রাখবেন যে, রুচিসম্মত সুন্দর বেশে রূপ আপনার অপরূপ হয়ে যেমন প্রশংসায় উজ্জ্বল করে তুলতে পারে পাঁচটি মুগ্ধ চোখকে, তেমনি বয়স আর কালের হিসেব না মানা সেই প্রসাধনই হাস্যস্পদ করে তুলবে আপনাকে পাঁচজনের কাছে। সুতরাং যে কোনো প্রসাধনের সবচেয়ে বড় কথা হওয়া উচিত, কি ভাবে সাজব, কখন সাজব আর কি বয়েসে সাজব।

সুষ্ঠু প্রসাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ঃ

মুখের জন্যে

(১) মুখে মাখবার নরম সাবান
(২) মেক আপ (foundation)
(৩) পাউডার, কমপ্যাক্ট্
(৪) পাউডার পাফ, ব্রাশ, স্পঞ্জ
(৫) রুজ (লিকুইড বা কেক)
(৬) ক্লিনসিং মিল্‌ক্, ক্রীম

ঠোঁটের জন্যে

(১) লিপস্টিক
(২) লিপস্টিক ব্রাশ
(৩) লিপ গ্লস
(৪) ক্রীম

চোখ আর ভুরুর জন্যে

(১) কাজল বা লাইনার
(২) পাতার জন্যে রঙ (Shadow)

(৩) মাসকারা

(৪) ভুরু তোলবার সন্না

(৫) ভুরু আঁকবার পেনসিল

(৬) ভুরুর ব্রাশ

(৭) খুব ছোট সরু চিরুনী

চুলের জন্যে

(১) শ্যাম্পু

(২) মাথার তেল

(৩) সরু, মোটা দুরকমের বড় চিরুনী

(৪) চুলের ব্রাশ

(৫) ক্লিপ, কাঁটা, চুলের ফিতে, কারলার

(৬) হেয়ার ড্রায়ার (hair drier)

টিপ

সিঁদুর, কুমকুম, বিভিন্ন রঙের তৈরি টিপ

হাত আর পায়ের জন্যে

(১) ক্লিপার, ফাইল

(২) লোশন

(৩) বিভিন্ন রঙের ম্যানিকিওর

(৪) রিমুভার

(৫) তুলো

(৬) গ্লিসারিন, গোলাপ জল, সাবান

(৭) নোখ পরিষ্কারের ব্রাশ

প্রসাধনে বসবার অন্তত আধঘণ্টা আগে সর্বাঙ্গে গোলাপজল মেশানো গ্লিসারিন বেশ ভাল করে ঘষে ঘষে মেখে নিয়ে কুসুম গরম জলে প্রচুর পরিমাণে সাবানের ফেনা করে চুল না ভিজিয়ে স্নান করবেন। এরপর এককাপ গরম দুধ খেয়ে ঘরের চারপাশের পর্দা টেনে বেশ ঠাণ্ডা আর অন্ধকার করে নিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে ঘুমোবেন অন্তত

আধঘণ্টা। এই সময় সমস্ত মুখে চন্দনের, আলুর বা শসার বেশ ঘন প্রলেপ লাগিয়ে রাখবেন। বিশ্রাম শেষে আস্তে খুব নরম কাপড় জলে দিয়ে মোটেই জোর না লাগিয়ে প্রলেপ তুলে ফেলবেন। এরপর চুলগুলো টান করে পেছনের দিকে বেঁধে রেখে সমস্ত মুখে, গলায়, ঘাড়ে, কানের পাশে ফাউণ্ডেশান লাগাবেন। ফাউণ্ডেশান সবসময় গায়ের রঙের থেকে একপোঁচ গাঢ় নিতে হবে। গায়ের রঙ যদি শ্যামলা ধরনের হয় তাহলে হালকা আর গাঢ় ছুটো রঙ মিশিয়ে ব্যবহার করলে খোলে ভাল। প্রথমে এক পোঁচ ফাউণ্ডেশান লাগিয়ে নিজের মুখখানি আয়নায় ভাল করে দেখুন। যে যে জায়গাগুলো ভরাট হলে মুখটা অপরূপ হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে, সেই জায়গাগুলোতে খানিকটা গভীর রঙের ফাউণ্ডেশান আঙুলের ডগায় নিয়ে হালকাভাবে লাগিয়ে আস্তে আস্তে কানের পাশে টেনে মিশিয়ে দিন। খেয়াল রাখবেন যে রঙটা লাগাবেন সেটা যেন কোনরকমেই চড়া হয়ে গিয়ে দৃষ্টিকটু না হয়ে পড়ে। ফাউণ্ডেশান বেশ ভাল করে শুকিয়ে গেলে তুলিতে সমান করে পাউডার নিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে মাখবেন মুখে, গলায়, ঘাড়ে, কানে, কানের পাশে। পাউডার আর ফাউণ্ডেশান এ ছুয়ের মধ্যে রঙের সমতা যাতে বজায় থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। যাঁদের গায়ের রঙ খুব ফরসা তাঁরা গাঢ় গোলাপী রঙ নেবেন। শ্যামলী নেবেন নিজের গায়ের সঙ্গে মানিয়ে হলদে (rachel) ধরনের। পাউডারের পর প্রয়োজন বোধ করলে Compact লাগাতে পারেন। যদি পাউডার লাগানো পছন্দ না থাকে তাহলে সরাসরি ফাউণ্ডেশানের ওপর pancake ব্যবহার করা চলতে পারে। জিনিসটি দেখতে Compact-এরই মতন। শুধু লাগাবার সময় পাফটি অল্প জলে ভিজিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

আপনার চেহারার মধ্যে যদি একটু লালচে সৌন্দর্য ছড়াতে আপনি ইচ্ছুক হন তাহলে ফাউণ্ডেশান দেবার পর খুব হাল্কাভাবে পাউডার রুজ ছুটো গালে ছড়িয়ে দেবেন সমান করে। খেয়াল রাখবেন রঙটা যেন সামান্য একটু লালচে আভা আনা ছাড়া আর একটুও বেশী প্রকাশিত না হয়। পাউডার বেশ খোলা হাতে ছড়িয়ে দিয়ে মুখের ব্রাশ (যেন নরম

হয় খুব) দিয়ে ঝেড়ে ফেলবেন সবদিক সমান করে। ঠোঁটে রঙ দেবেন এর পর।

যাঁরা লিপ ব্রাশ ব্যবহার করতে চান তাঁরা স্টিক থেকে ব্রাশের প্রান্তভাগে অল্প করে রঙ তুলে নেবেন। এরপর ব্রাশ সোজা করে ধরে ঠোঁটের মাঝখান থেকে ডানদিকে ঘুরিয়ে ঠোঁটের দাগে দাগে একটা রেখা এঁকে নেবেন। ধারের দিকে ঢালু করে নামিয়ে এনে প্রান্তভাগ আবার একটু ওপর দিকে তুলে শিল্পীর ছবি আঁকার ভঙ্গিতে বেঁকিয়ে দেবেন একটু। বাঁদিকেও রেখা আঁকবেন এই ভাবেই। দুদিকেরই বাইরের রেখাটা খুবই যত্ন আর সতর্কতার সঙ্গে আঁকতে হবে কারণ এর ওপরই নির্ভর করে রঙ করার সবটুকু কুশলতা। দুদিকের রেখা সুন্দরভাবে আঁকা হয়ে গেলে খুব সাবধানে তুলির টানে টানে রঙ ভরাবেন মাঝখানটায়। তুলিতে রঙ যেন সব সময় সমান থাকে। ওপর ঠোঁট হয়ে গেলে নিচের ঠোঁটে রেখা আঁকুন আর একই ভাবে রঙ ভরান। নিচের ঠোঁটের প্রান্তভাগে যেন কোন রেখা আঁকবেন না।

যাঁদের ঠোঁট পাতলা তাঁরা সমস্ত ঠোঁটটা ঢেকে রঙ করবেন। তাতে ঠোঁট পাতলার ওপর বেশ ভরাভরা মতন হয়ে ভারী সুন্দর দেখাবে। যাঁদের ঠোঁট স্বভাবতই মোটা তারা নিচের ঠোঁটে খানিকটা বাকি রেখে রেখা টেনে খুব গাঢ় করে ভেতরটা ভরাট করবেন। যাঁরা স্টিক থেকে সোজাসুজি রঙ করতে পছন্দ করেন তাঁরাও রঙ করবেন ঐ একই পদ্ধতিতে। স্টিকটাও ধরবেন ওপরের দিকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে।

দিনের আলোয় কোনো অনুষ্ঠানে গেলে লাল রঙ ব্যবহার না করাই ভাল। তখন নিজের নিজের ত্বকের রঙ অনুযায়ী ফরসারা গোলাপী, শ্যামলীরা ম্যাজেণ্টা আর কালো মেয়েরা ব্রোঞ্জ রঙ লাগিয়ে তার সঙ্গে খুব হাল্কা করে 'লিপগ্লস' ব্যবহার করলে সমস্ত মুখটা জুড়ে একটা সুকুমার রুচির ছাপ এনে দেবে।

রাতের অনুষ্ঠানে চম্পকবর্ণা সুন্দরী ব্যবহার করবেন গাঢ় লাল কিন্তু লিপগ্লস ব্যবহার করবেন বেশ হাল্কা করে। যাতে আপনাকে দেখামাত্র সবকটি চোখের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত না হয় একমাত্র আপনার বিম্বাধরে।

মুখের বাকি অংশও তো আপনি সাজিয়েছেন সমান ভাবেই শিল্পীর অধ্যবসায়ে।

শ্যামলা রঙে সিঁদুরে (Red Red) লাল খুলবে ভারী সুন্দর। সঙ্গে হাল্কা লিপগ্লস দিতে ভুলবেন না। দিনের বেলা কিন্তু যথাসম্ভব হাল্কা করে ম্যাজেণ্টা রঙ দিলে ভাল দেখাবে। অন্য রঙের প্রতি যতই মোহ বা মুগ্ধতা থাক নিজেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করে তবেই প্রসাধনের টেবিল সাজাতে হবে। এ নিষ্ঠুরতা না থাকলে কিন্তু যে আকাঙ্ক্ষায় আপনার এত সাধনা তার সবটুকুই ব্যর্থ হয়ে গিয়ে পাঁচজনের কাছে হাস্যকরই হয়ে উঠতে হবে শুধু। ঠোঁটের রঙ যদি কোনরকমে রেখার বাইরে বেরিয়ে আসে একটুও, তবে পাতলা কাপড়ের টুকরো দিয়ে খুব সাবধানে টিপে টিপে, মুছে ফেলবেন তক্ষুনি।

এবার ভুরু। যেহেতু ভুরুর লোম তোলাটা খানিকটা বেদনাদায়ক ব্যাপার, তাই প্রসাধনে বসার সময় বা বিশেষ কোথাও যাবার দিনে এ কাজে হাত দেবেন না কখনো। অন্য যে কোনো দিন হাতে যখন সময় থাকবে বেশ খানিকটা, তখনই সেই সময়টুকু রাখবেন এই অবাঞ্ছিত কিন্তু অপরিহার্য কাজটুকুর জন্যে। অনেকে ভুরুর লোম একেবারে কামিয়ে ফেলে তারপর পেনসিল টানেন নিজের পছন্দ মতন রেখায়। এর থেকে বিসদৃশ ব্যাপার বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না।

যাঁদের ভুরু মোটা, অর্থাৎ লোম ঘন বা সাজানো নয় তাঁরা সন্না দিয়ে যথাযথভাবে লোমগুলো তুলে ফেলে পেনসিল টানবেন তার ওপর। লোম তোলবার সময় সামনের আর শেষের দিকে সরু করে মাঝখানটা সামঞ্জস্য রেখে চওড়া আর সেই তুলনায় ঠিকমতন মোটা করে ধনুকের আকার আনবেন। ভুরু যদি শেষের দিকে ছোট হয়, অর্থাৎ শেষ দিকে লোম না থাকে তাহলে প্রয়োজনমতন রেখা টেনে নেবেন পেনসিল দিয়ে। আঁকবার সময় শুধু লাইন টানবেন না। পেনসিলের মুখটা খুব সরু করে ছোট ছোট সূক্ষ্ম রেখা আঁকবেন ঠিক লোমের মতন যাতে মনে হয়। এতে সবটা মিশিয়ে সুন্দর একটা শ্রী নেবে বেশ স্বাভাবিক হয়ে। এরপর আঙুলের ডগায় খুব সামান্য ভেসলিন নিয়ে একেবারে হাল্কা হাতে ছুঁইয়ে

দেবেন ভুরুর ওপর দিয়ে (পেনসিল আঁকা রেখাতে দেবেন না)। এতে লোমগুলো বিন্যস্ত থাকবে সমস্তক্ষণ।

চোখ সাজাবার সময় প্রথমে লাগাবেন মাসকারা। যদিও বিভিন্ন রকম আধারে পাওয়া যায় কিন্তু ছোট্ট বাক্সের মধ্যে কেকের মতনগুলোই সুবিধাজনক বেশী। মাসকারার সঙ্গেই যে ছোট ব্রাশ থাকে ব্যবহার করবার আগে সামান্য জলে দিয়ে সেটা ভিজিয়ে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কেকটাতেও দিতে হবে দু/এক ফোঁটা জলের ছিটে। একটু কাদা কাদা নরম হয়ে গেলে ব্রাশে বেশ সমানভাবে রঙ তুলে ওপরের চোখের পলকের ভেতর বা নিচের দিকে গোড়া থেকে প্রান্তভাগ অর্থাৎ চোখের পলকের উৎপত্তি থেকে শেষভাগ পর্যন্ত ব্রাশটা ওপর দিকে তুলে তুলে পলকগুলো মুড়ে দিয়ে দিয়ে ভাঁজ ফেলবার মতন করে লাগান। লাগাবার সময় খুবই সাবধান হতে হবে যাতে কোনরকমেই জিনিসটার একটুও চোখের ভেতর না লাগে, চোখে লাগলে চোখ বেশ জ্বালা করবে। শিশিতে লিকুইড নিলেও লাগাবার পদ্ধতি হবে একই রকম।

প্রথমে এক পোঁচ লাগিয়ে নিয়ে শুকিয়ে গেলে দেখুন পলকগুলো ওপরের দিকে বেশ বাঁকা বাঁকা লাগছে কিনা। এরপর নিচের পলকগুলো ধরুন। তলায় একটা পাতলা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ধরুন। নাহলে হঠাৎ কালি লেগে যেতে পারে গায়ে।

একই ভাবে সুরু থেকে প্রান্তভাগ রঙ করবেন, তবে নিচে কাজ করবার সময় তুলিতে কালি নেবেন খুবই কম। হয়ে গেলে আবার ওপরের পলকে বাইরের দিক থেকে অল্প অল্প তুলি টেনে দেবেন।

তুলিটা তখন ধরবেন দু' আঙুলের মাঝখানে আড় করে। ইচ্ছে করলে এবার ওপরের পাতার ভেতরের দিকে কাজলের রেখা টানতে পারেন। একটা সরু কাঁটাতে কাজল লাগিয়ে ওপরের চোখের পাতার কোণের দিকে শুইয়ে ধরে চোখটা বন্ধ করে কাঁটাটা টেনে দেবেন সমান হাতে। এবার চেয়ে দেখুন তো আয়নার মধ্যে নিজের জোড়া চোখের দিকে! মাসকারা ঢাকা ঘনপক্ষের আড়াল থেকে একটুখানি কালোর আভাস কি অনিন্দ্য কমনীয়তায় ভরে দিয়েছে

সমস্ত মুখখানি। কালির কাজ শেষ হলো। মৃগনয়না সুন্দরীরা কিন্তু সব সময় মনে রাখবেন যে, যখন যত রাতই হোক, অনুষ্ঠানের শেষে বাড়ি ফিরেই, মুখের অন্য সব প্রসাধন তোলবার আগে, সহ্য হওয়া গরম জল চোখের পলকে ঝাপটা দিয়ে দিয়ে ধুয়ে ফেলে পরে সাবানের প্রচুর ফেনা করে ঘষে ঘষে উঠিয়ে ফেলতে হবে কালির রেশটুকু পর্যন্ত। তারপর সম্ভব হলে যে কোনো চোখের লোশন দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলে অল্প করে ক্রিম লাগিয়ে নেবেন পাতার ওপর। একটু কষ্ট স্বীকার করে এটুকু না করলে কিছুদিন ব্যবহারের পরেই এক ধরনের 'মাসকারা এলার্জি' হয়ে গিয়ে মাসকারা লাগালেই চোখের পাতা ফুলে উঠবে। কি কষ্ট তখন বলুন তো?

অনেকে চোখের পাতায় রঙ লাগানোটা অতি আধুনিক প্রসাধন রীতি বলে মনে করেন। রীতি যাই হোক, এতে সমস্ত চেহারার মধ্যে যে উগ্রতাটুকু ফুটে ওঠে তা নরম বা অতি শিল্পী-ভাবাপন্ন বাঙালি রুচিকে পীড়িত করে। তাই এ প্রসাধন যদি করতেই হয় তাহলে তা করতে হবে খুব সাবধানে অতি নিপুণতার সঙ্গে। যাঁদের রঙ সত্যিকার কালো তাঁরা শখ থাকলেও এ পথে পা দেবেন না কোনো মতেই। বিদেশে কৃষ্ণা সুন্দরীদের ব্রোঞ্জ রুজ (Blush on, অর্থাৎ লজ্জারুণ হয়ে উঠলে শিহরিত কপোল তাঁদের সত্যিই যে রঙ ধারণ করত), বা চোখের পাতায় (Bronze Eye Shadow) দিয়ে আরও সুন্দরী হবার শখ হয়তো মানাতে পারে কিন্তু আমাদের নরম প্রকৃতিতে সেটা হয়ে উঠবে বড়ই একটা বিপাকের ব্যাপার।

কালো যাঁদের ত্বকের রঙ তাঁরা চোখের পাতায় অল্প করে ভেসলিন লাগিয়ে নেবেন। এতে চোখের ওপরটা তেলতেলে হয়ে উঠে বেশ বড় দেখাবে চোখদুটো।

শ্যামলী কন্যা (কন্যা বলার উদ্দেশ্য, তিরিশোর্ধে এই বিপজ্জনক ঝুঁকি না নেওয়াটাই বিধেয়) ব্যবহার করতে পারেন খয়েরী (Brown) আর ঘষা সবুজ (Dull Green)। এতে তাঁদের গায়ের রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্যের সুষমায় ফুটিয়ে তুলবে এক কল্পলোকের ব্যঞ্জনা।

বিধাতার অকৃপণ দানে যাঁদের অঞ্জলি ভরা সেই স্বর্ণবর্ণা তাঁর দুটি ডাগর চোখে নির্দ্বিধায় আনবেন সুদূর নীলিমার ছায়া। কখনো বা গোধূলির সোনালীতে নতুন এক ভাবের দ্যোতনা।

ব্লাশার লাগানোটাও বাঙালি রুচিতে খুব সুখকর বলে মনে হয় না। আপনার বয়েস যদি তিরিশের কোঠা পার হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এ চেষ্টাটাও না করাই ভাল। প্রসাধনের আসল উদ্দেশ্য হলো নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে সুন্দর একটা চিত্রলতা এনে পরিচিত পরিবেশে নিজেকে মোহময়ী করে তোলা। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষায় নিজের বয়েস, ত্বকের রঙ আর সময়ের বিচার না করে চললে সে শুধু এক চাপা হাসির বিড়ম্বনা হয়ে উঠবে সকলের কাছে।

খুব কচি বয়সেও ব্লাশার ব্যবহার করা কিছুতেই উচিত নয়। কুড়ি থেকে ২৫/৩০ বছর বয়সে যে কোনো প্রসাধন করা চলে নির্ভয়ে। তবে এ ক্ষেত্রেও সযত্ন আর সতর্ক হতে হবে খুবই। রঙ যদি আপনার সোনা ধরনের উজ্জ্বল হয় তাহলে ব্লাশার চলতে পারে একটু উজ্জ্বল হয়ে। কিন্তু সেই ঔজ্জ্বল্য যেন কোনরকমেই প্রসাধনের আর সব রঙকে ছাপিয়ে ফুটে না ওঠে। গালের ওপরের ভাগ থেকে নিচের দিকে মাঝামাঝি পর্যন্ত গোল করে ব্লাশার ছড়িয়ে নিয়ে ডানদিকে খানিকটা পর্যন্ত টেনে নেবেন। এবার শুধু পাউডার পাফটা হাল্কাভাবে বুলিয়ে দিন। এতে রঙের বেশী প্রখরতা চাপা পড়ে কুয়াশা ঢাকা পুব আকাশের নতুন উষার রাঙা আলোর ছটার মতন ছড়িয়ে পড়বে অস্পষ্টতার একটা মিষ্টি লালিত্য।

এর পর কপালে টিপ। বয়স যাদের চল্লিশ পার হওয়া তাঁরা লাল কুমকুম, লাল বা গোলাপী কেনা টিপ বা সিঁদুরের টিপ পরবেন। যাদের বয়েস তার নিচে তারা সবসময় শাড়ির রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে নেবেন টিপেরও। কানেও দেবেন সেই রঙেরই টপ (অবশ্যই নকল, নাহলে প্রতিটি শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে আসল পাথর কিনতে হলে··· সর্বনাশ !) আর বারবার যে কথা বলা হচ্ছে, এখানেও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে যে, শাড়ি, টিপ, কানের পাথর, চটি, ব্যাগ,

সমস্তটা জুড়ে রঙের একটা সুষম সামঞ্জস্য আনলে তবেই সেই ছন্দোবদ্ধ মোহময়তা কোন শিল্পীর আঁকা ছবির মতন মনোরমা করে তুলবে আপনাকে।

মুখের প্রসাধন শেষ করে এবার চোখ ফেরান হাতের দিকে। আমাদের মেয়েরা বেশীরভাগ সময়েই অনেক ধৈর্য আর সময় দিয়ে মুখে ফুটিয়ে তোলেন প্রসাধনের নিখুঁত পারিপাট্য, অথচ তাঁরাই কি নির্মম-ভাবে অবহেলা করে থাকেন নিজেদের হাত আর পা-কে। আশ্চর্য, তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না যে, এমন অনিন্দ্য সুন্দর একটি মুখের অধিকারিণী যখন মিষ্টি একমুখ হেসে বাড়িয়ে ধরেন রুক্ষ, কঠিন দুটি হাত বা হেঁটে চলেন অসংস্কৃত কর্কশ দুটি পা ফেলে ফেলে তখন সেদিকে চেয়ে কি অসহ্যভাবে পীড়িত হয়ে ওঠে দর্শকদের অসহায় কতগুলো চোখের দৃষ্টি। তাই যে যত্ন আর সতর্কতায় রেখা টানতে হয় চোখের দুটি পাতায়, ভ্রূর ছন্দে আর ঠোঁটের সৌষ্ঠবে, সেই একই মমতায় সাজাতে হবে হাত পা-কেও।

অল্প জলে রাধামাটি একটু ঘন করে গুলে ওপর হাত থেকে সুরু করে আঙুলের ডগা পর্যন্ত লাগাবেন সমান করে। সবদিকে সমানভাবে লাগানো হয়ে গেলে বাচ্চাদের ব্যবহারের জন্যে যে তুলোর পাফ পাওয়া যায় সেই পাফ দিয়ে বেশ ভাল করে পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে ঝেড়ে ফেলবেন মুখে মাখবার ব্রাশ দিয়ে।

হাতে যদি লোমের আধিক্য থাকে তাহলে ব্লেডে কামিয়ে বা লোম পরিষ্কার করবার বাজার চলতি যে কোন লোশন বা ক্রীম ব্যবহার করে পরিষ্কার করে নেবেন প্রসাধনে বসবার অন্তত আধঘণ্টা আগে। হাত বা পায়ের লোম যেহেতু অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে তাই ক্রীম ব্যবহারের থেকে 'ওয়াক্সিং' (waxing) করাটাই বিধেয়। নিজের হাতে বাড়িতে এভাবে করবার আগে প্রথম দু' একবার বিউটি সেলুনে করা উচিত।

সবদিকে সমান আর সুন্দরভাবে পাউডার লাগানো হয়ে গেলে রঙ দেবেন নোখে। কখন কি রঙ কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে সে

সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আগেই করা হয়েছে। সেইমত নোখ রাঙিয়ে নিয়ে ডান হাতের অনামিকায় বা বাঁ হাতের প্রথম আঙুলে একটা বড় পাথর বসানো আংটি পরে নেবেন ঠিক শাড়ির রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে।

প্রসাধন সুরু করবার আগে কুসুম গরম জলে সাবানের প্রচুর ফেনা করে ব্রাশ দিয়ে ঘষে ঘষে পায়ের পাতা আর নোখ পরিষ্কার করবেন। এরপর কোন স্কিনটনিক বা ময়শ্চারাইজার বেশ বেশী করে প্রলেপের মতন লাগিয়ে রাখবেন আধঘণ্টা। এরপর হাতের মতন করে রাধামাটি গুলে পায়ের গোড়ালি থেকে নোখ পর্যন্ত সমস্ত পাতাটা জুড়ে সমান করে লাগিয়ে নিয়ে গায়ে মাখবার সাদা পাউডার ছড়িয়ে দেবেন পাফ দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে। এবার রঙ করুন পায়ের নোখ। যে রঙ হাতের নোখে ঠিক সেই রঙ। এবার শাড়ির প্রান্তভাগ একটুখানি তুলে একবার ঘরময় হেঁটে বেড়ান। দেখুন নিজের চলার ছন্দে মুগ্ধ হয়ে উঠছে নাকি নিজেরই ছুটি চোখের তারা।

বেশবাস

আপনি কি সত্যিই সুন্দরী হতে চান? কেমন করে বেশেবাসে বিধাতার দান আপনার স্বাভাবিক রূপকে অপরূপ করে তুলে হাজার জনের ভিড়ে বিশেষ একজন হয়ে ওঠা যায় যদি জানতে যান তাহলে জেনে রাখুন, আপনার আত্মবিশ্বাসই নিজেকে সুন্দরী করে তোলবার একমাত্র মন্ত্র।

আপনার রঙ হয়তো বেশ কালো আর আপনি সেজন্যে পথেঘাটে তো বটেই আপনার একান্ত প্রিয় পরিজনদের কাছেও কালো হয়ে থাকেন লজ্জায়। কিন্তু না, তা হবেন না। আপনি সব সময় মনে রাখবেন যে, রঙে খানিকটা হলেও রূপ বলতে কিন্তু কিছুতেই শুধু রঙই বোঝায় না। এ সম্বন্ধে আগেই যা বলা হয়েছে, সত্যিকার পাঁচজনের দৃষ্টি টেনে রাখা যে সৌন্দর্য, ইংরিজিতে যাকে বলা হয় attractive তা পেতে হলে রঙ ফরসা কালো যাই হোক সবথেকে আগে থাকা চাই আপনার সুন্দর একটা নিজের ভঙ্গিমা। ইংরিজিতে যাকে বলে grace। আপনি সব সময় চলাফেরা করবেন তেমনি gracefully। পরিমিত নয়, বেশ প্রাণোচ্ছল হাসি, (নিশ্চয়ই প্রগল্‌ভ ভাবে নয়) সুন্দর কথা বলবার ভঙ্গি, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা নিশ্চয়ই পাঁচজনের মনে রেখা ফেলে।

কালো মেয়েরা নিজেদের বেশবাসের দিকে একটু বেশী করে নজর দেবেন। তেল না মাখা শ্যাম্পু ঘষা চুলে ফ্যাশানের একটা হাওয়া আছে ঠিকই কিন্তু তবুও সমস্ত চেহারাটার ওপর তা যেন কেমন একটা রুক্ষু রুক্ষু ভাব এনে রঙ যেন খসখসে করে তোলে আরও। কিন্তু তাই বলে সেই তেল তো কিছু আর গড়িয়ে পড়বে না নাকের ডগা বেয়ে। এই দুইয়ের মাঝে একটা সুষম সমতা আনতে বেশ হাল্কা ধরনের কোন তেল অল্প অল্প ছুঁইয়ে মাখবেন সমস্ত চুলে। তেল এমনভাবে বেছে

নেবেন যার হাল্কা একটা মিষ্টি গন্ধ যেন ভেসে ভেসে চলে আপনার সঙ্গে। আপনি যেখানেই যাবেন আপনি পৌঁছবার আগে বাতাসে সুবাস এসে জানিয়ে দেবে 'সে এসেছে'। আর আপনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই সুগন্ধ মানুষের মনকে আনন্দের মতন টানবে আপনার দিকে।

এছাড়া চুল আঁচড়াবার ধাঁচেও আনতে হবে বিশেষত্ব। বিভিন্ন ধরনের সামনে করে করে বারবার আঁচড়ে দেখবেন কোন বিশেষ ধাঁচটি মানাচ্ছে আপনার মুখে সবচেয়ে বেশী। এক দিনে হবে না। এর জন্যে চাই বেশ কিছুদিনের চিন্তা আর ধৈর্য। একবার ঠিকমতন পেয়ে গেলে সেটাই করে নেবেন আপনার নিজস্ব 'স্টাইল'। এই স্টাইল অর্থাৎ নিজস্ব ধাঁচ বা একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিটিই হচ্ছে আপনার সব সৌন্দর্যের চাবিকাঠি। আপনার চলায়, বসায়, কথা বলবার লালিত্যে, চুলের মিষ্টি একটা ভঙ্গিতে, শাড়ির আঁচলটি ফেলে রাখবারও নিজস্ব একটি মাধুর্যে মনোরম হয়ে উঠবে সব কিছু। পাঁচটি মুগ্ধ চোখ বারবার ফিরে ফিরে ভাববে রঙটা কালো হলে কি হয়—ভারী সুন্দর তো সবটা মিলিয়ে!

কালো মেয়েরা কখনো খুব বেশী সাদা ধরনের শাড়ি পরবেন না। খুব বেশী ঝকমকে রঙও নয়। বাসন্তী, বাদামী, ম্যাজেন্টা, ময়ূরকণ্ঠি, ইটরঙ, জামরঙ শাড়ি ব্লাউজের সঙ্গে ম্যাচ করে পরবেন। সাদা যদি পরতেই হয় তাহলে পায়ের চটি থেকে হাতের ব্যাগ সবই সাদা নেবেন আর তার সঙ্গে সুন্দর করে মানিয়ে নেবেন হাল্কা একটা রুপো বা মুক্তোর সেট।

বেশ বিন্যাসের সময় সবচেয়ে আগে মনে রাখতে হবে সময় আর অনুষ্ঠানের কথা। অর্থাৎ যে শাড়ি দিনের বেলায় কলেজে বা অফিসে চলে সেই শাড়িই একেবারে অচল কোন সান্ধ্য আসরে। তার মানে দিনের বেলা দৈনন্দিন কাজে যখন বেরোতে হবে তখন গায়ের রঙ যেমনই হোক না কেন, বেলার রঙটা দেখে তবেই হাত বাড়াতে হবে কাপড়ের আলমারির দিকে। না হলে ভাবুন তো একবার কটকটে চৈত্রের বেলায় আপনি একটা টকটকে লাল শাড়িতে শরীর জড়িয়ে

পথ আলো করে চললেন খটখটিয়ে। আপনার হয়তো লাল রঙটার ওপর দারুণ দুর্বলতা। কিন্তু বেচারা আর পাঁচজন! তাদেরও তো দৃষ্টি বা রুচি বলে কথা আছে একটা? ঠিক এই কারণেই কালো, বেগুনী, জাফরাণী···অর্থাৎ যে কোন খুব গভীর রঙ বা জরি-শলমার কাজ করা পোশাক দিনের বেলায় না পরাই উচিত। হাল্কা হলদে, গোলাপী, হাল্‌কা নীল, যে কোন রকমের পাঁচমিশেলী ছাপা শাড়ি ঝাঁ-ঝাঁ করা রোদের বেলায় পরলে নিজের আরামের সঙ্গে দৃষ্টি সুখকর হয়ে ওঠে পাঁচজনেরও। লাল না চললেও শীতকালের রঙের কড়াকড়ি নেই কিন্তু এতটা।

শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ ম্যাচ না করে কখনো পরা উচিত নয়। ম্যাচ করা চোলি, শাড়ির সঙ্গে হাল্‌কা ধরনের গয়না (নিশ্চয়ই নকল) টিপ, চটি, ব্যাগ সব বেশ এক ধরনের রঙের পরবার চেষ্টা করবেন। না··· 'বাব্বাঃ কি ভয়ানক কথা' বলে চমকে উঠবার দরকার নেই! সকলেই জানেন আজকের বাজারের অবস্থা। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সব গিন্নীরই আজকের মধ্যবিত্ত পরিবারে। কিন্তু বাইরে বেরুনো মেয়েদের নিজের ব্যবহারের তিন চারটে ব্যাগ থাকেই। এই ব্যাগ কটিই যদি একটু হিসেব করে লাল, কালো, হলদে আর দু তিন রকমের রঙ মেশানো কিনে ফেলা যায়, তাহলে যে কোন শাড়ি পরলেও ম্যাচিং ব্যাগ পেয়ে যাবেন আপনি হাতের কাছেই। চটির বেলাতেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

দিনের বেলা লিপস্টিক কখনো খুব গভীর রঙের লাগাবেন না। এ সম্বন্ধে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। সুতরাং এর আগে যে কথা বলা হয়েছে সেই কথাটাই আবার বলি যে টিপও তিরিশের ঘর পর্যন্ত মেয়েরা সব সময় পরবেন শাড়ির রঙের সঙ্গে সমতা রেখে। অর্থাৎ যে রঙের শাড়ি পরবেন টিপ পরবেন ঠিক সেই রঙের। সঙ্গে সঙ্গে কানের টপ, একটু বড় ধরনের ঠিক শাড়ির রঙের। এইরকম সমস্ত শরীরখানি ঘিরে রঙের একটা মোহময় খেলা আপনার সৌন্দর্যশ্রীকে এক কথায় করে তুলবে অনুপম!

বয়সের কথায় মনে এল বয়েসটাই রূপ চর্চার সবচেয়ে বড় কথা। চোদ্দ থেকে কুড়ি বছরের কিশোরী বা তরুণী যা পরতে পারে সচ্ছন্দে, পঁচিশ তিরিশ বছরের যুবতী তাই পরতে গেলে হাস্যাস্পদ হবেন পাঁচজনের কাছে। আর চল্লিশ বছর পার করে শীতের জীর্ণতায় হেলে পড়া হেমন্ত বেলার বয়সটা—বড় স্পর্শকাতর, বড় ভাবনার এই সময়টা।

পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের কোঠা পার হয়ে যাওয়া মহিলাদের কখনো বড় বড় ছাপ বা খুব বড় ফুল তোলা শাড়ি পরা উচিত নয়। ঢালা এক রঙের বা ছোট ছোট বুটিদার তাঁত, মুর্শিদাবাদী, বিষ্ণুপুরী ধরনের শাড়ীতে এই বয়সে বেশ একটা আভিজাত্য আনে। মুখের প্রসাধনেও এই সময় খুবই সাবধানী হওয়া উচিত। উগ্র মেক-আপ বা খুব গাঢ় রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করা কিছুতেই উচিত নয়। নিজের নিজের ত্বকের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে নামী কোন ফাউণ্ডেশানের সঙ্গে থাকবে সেই রঙেরই পাউডারের খুব হালকা একটুখানি স্পর্শ। কপালে মুখের সঙ্গে মানানসই বড় একটা লাল কুমকুম বা সিঁদুরের টিপ। দু একগাছি রুপোলী রেখার ছোঁওয়া লাগা গোধূলিবেলার চুল ধরা থাকবে একটি অনুচ্ছল বিনয়ী খোঁপার বিন্যাসে। "বাঃ" চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আপনিই শ্রদ্ধায় নরম হয়ে আসবে পাঁচটি অপরিচিত চোখের দৃষ্টি।

সকালে বা দুপুরে কাজের সময় যে পোশাক পরবেন সন্ধ্যের সময় কোন সামাজিক আমন্ত্রণ বা কোন অনুষ্ঠানে কি যাবেন সেইভাবে? নিশ্চয়ই নয়। সারাদিনের সব নিয়মের হুঁশিয়ারী ঠেলে ফেলে ফ্লুরসেণ্টের নীলচে আলোর দ্যুতি যখন ঘরে ডেকে আনবে আকাশের জ্যোৎস্নাকে, তখন আপনি নির্ভয়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন আপনার কাপড়ের আলমারির সামনে। বুক ফুলিয়ে বার করে নিতে পারেন আপনার অনেক আদরের সেই আবির গোলা পিওর সিল্কখানি। খুন খারাবী লাল সমুদ্র নীল, অপরাজিতা বেগুনী, ময়ূরের মতন পেখম মেলা আর কত রঙ আছে আপনার? চলবে সবই।

শ্যামলী মেয়ে দিনের বেলায় পরবেন হালকা হলদে, আশমানী, ম্যাজেন্টা, হালকা জাম, তাঁতের নানারকম চেক বা ডুরে আর পাঁচমিশেলী

ছাপা শাড়ি। রাতে খুব টকটকে লাল পরবেন না, তবে কালচে লালের সঙ্গে সরু জরির পাড়, গাঢ় হলদে, ইট রঙ, গাঢ় কমলা এই ধরনের সব রঙ এনে দেবে সুন্দর একটা ছিমছাম উজ্জ্বলতা।

কালো মেয়েরা রাতে ব্রোঞ্জ রঙ খুব নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন। হালকা সোনালী, হালকা খয়েরী রঙগুলোও মানাবে সুন্দর। সবচেয়ে ভাল হয় যদি তাঁরা বেশবাসের বেশীরভাগ সময়ই পাঁচমিশেলী ছাপা, চেক বা ছোট ছোট নানারঙের ফুল তোলা শাড়ি পরেন। রাতে বিশেষ কোনো পার্টি বা অনুষ্ঠানে দামী সিল্কের ছাপা বা লম্বা ধারী দেওয়া শাড়ি খুব সুন্দর চলতে পারে। এতে রঙ বাছার এত কড়াকড়ি ঝামেলা ছাড়াও নানারকম ছাপা বা ফুলের ভিড়ে বিশেষ কোন একটা রঙের প্রভাব পড়বে না, আর নানারকম নকশার সৌকর্যে ছড়িয়ে দেবে একটা আনন্দোচ্ছল ভাব।

খুব ফরসা যারা তাদের তো রাতের যে কোন অনুষ্ঠানে অধিকার আছে চোখ ধাঁধান রঙের বন্যা আনার। শুধু মনে রাখতে হবে বয়সের সীমা রেখাটা।

বিয়ে বাড়িতে জড়োয়া সেট, মুক্তো সেট, ভারী ভারী চুড়, কঙ্কন, বাউটি, নেকলেস—গোটা একটা লকার নিজের শরীরে তুলে নেবার প্রবণতা আছে প্রায় প্রতিটি বাঙালী মেয়ের। যাকগে, চিরকালের সংস্কার বা সখ না হয় মেটানোই গেল একদিন। কিন্তু ছোট ছোট চা-চক্র গোছের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে যতখানি সম্ভব ছিমছাম গয়নাগাটি পরা উচিত। এসব সময় পুঁতি বা কাচের গয়না (যেটা আমাদের বাঙালী সমাজে চলেও ঠিক যেন চলতে চাইছে না এখনও) শাড়ির রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে কানে, গলায়, হাতে পরলে খুব সুন্দর তো দেখাবেই, উপরন্তু হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া সোনার দিকে চেয়ে অসহায় হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলার হাত থেকেও বাঁচা যায়।

আহার

একথা সকলেই জানেন যে মানুষের সৌন্দর্যের পঁচাত্তর ভাগ নির্ভর করে তার সুগঠিত দেহ সুষমার ওপর। আপনার হয়তো আছে পদ্মকলির মতন দুটি ডাগর চোখ, তিল ফুলকে লজ্জা দেওয়া নাকের গঠন, ঠোঁট, কপাল সেও কোন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি যেন। কিন্তু এত সত্ত্বেও সুন্দর কেন লাগে না ঠিক তেমনি করে! মনে হয়না কেন, এ কোন তিলোত্তমা নেমে এল স্বর্গের নন্দন কানন পেছনে ফেলে রেখে? আসলে সব থেকেও আপনার শরীরে নেই স্বাস্থ্যের দীপ্তি যার আকর্ষণে শরীরে নামে জোয়ার। দুকূল ছাপানো নদীর বুকের মতন ডাকে বান। অথচ একটু চেষ্টা করলেই আপনিও হতে পারেন ঠিক এমনি একটি শরীরের অধিকারিণী। নিয়মিত আহার আর ব্যায়ামেই আপনি পেতে পারেন এই সম্পদ।

আমাদের দেশের মেয়েদের চিরকালের ধারণা যে, যেহেতু তারা এক একটা সংসারের কর্ত্রী আর তাদের হাতেই থাকে সংসার পরিচালনার দায়িত্বভার, তাই সকলকে সব রকম সেবাযত্ন করে, খাইয়ে পরিয়ে যা বাঁচে তাই তাদের যথেষ্ট। এতেই নাকি সংসারে লক্ষ্মী থাকেন অচলা হয়ে—লক্ষ্মীমন্ত সংসারও বলে নাকি তাকেই। ধারণাটা যে কত ভুল তা আগেকার দিনে জন্মলগ্নে শতশত শিশু আর প্রসূতির অপমৃত্যুই প্রমাণ দিত। তবু তো সেদিন নির্ভেজাল খাদ্যপেয় পাওয়া যেত কত সহজে আর কত প্রচুরভাবে। তা সত্ত্বেও স্বামী-সন্তানের তৃপ্তির জন্যে সবটুকু উজাড় করে তাদের পাতে ঢেলে দিয়ে অবশিষ্টাংশে কোনরকমে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে মহৎ ত্যাগের একটা মধুর আনন্দ হয়তো পাওয়া যেত, কিন্তু অবোধ শরীর তাতে সাড়া দিত না কিছুতেই। আর আজ এই দুর্মূল্য আর ভেজালের দিনে এক পেট খেয়েও যখন ক্যালরির হিসেব

মেলানো যায় না কিছুতেই ঠিকমতন, তখন পরিবারের সকলকে তৃপ্তি দিয়ে খাওয়ানোতেই নারী জীবনের চরম সার্থকতা, ঠাকুমা-যুগের সেই আদর্শ চলতে পারে না কিছুতেই।

নারীকে আজ ঘরে বাইরে হাল ধরতে হয়েছে সমানভাবে। পরিশ্রম প্রচুর, এই পরিশ্রমে প্রতিদিন শরীর থেকে যে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে, তা পূরণ করতে হলে চাই প্রয়োজনমত সুষম খাদ্য। এ নাহলে বাঁচা যায় না। আর খাদ্যের কথায় সবচেয়ে আগে মনে আসে আমাদের খাবার অভ্যেসের কথা। সাধারণত বাঙালী পরিবারে আমাদের রান্না আর খাওয়ার প্রণালীটা এমনই যে সেই রান্নায় অতি সুস্বাদু রসনা আর দৃষ্টি সুখকর বেশ কতগুলো পদ হয়তো এসে প'ড়ে পাতের চারপাশে কিন্তু ভেজে, কষে, সেদ্ধ করে তারপর সাঁতলিয়ে তার যা অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় তাতে খাদ্যগুণের লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না আর। তাই এই বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করবার দিন এসেছে আজ। আর সেই চিন্তা নিজের নিজের সংসারের জন্যে করবেন তো গৃহিণীরাই। সংসারে খাদ্যের দৈনন্দিন ব্যবস্থা তো তাঁরই হাতে।

সুষম খাদ্য, খাদ্যগুণ আর ক্যালোরি নিয়ে গবেষণা চলেছে আজ সারা বিশ্বজুড়ে। একজন মানুষের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে সাধারণভাবে চাই আমিষ, স্নেহপদার্থ, খনিজপদার্থ, শর্করা আর ভিটামিন। আপনি রোগা বা মোটা যাই হতে চান না কেন, খাদ্যের এই কয়টি উপাদান যথাযথভাবে নিয়ে আপনাকে তৈরী করতে হবে আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা। আর সেই তালিকা করবার সময় সবচেয়ে আগে মনে রাখতে হবে আপনার বয়স আর শারীরিক উচ্চতার কথা। কারণ বয়স আর উচ্চতার ওপরই নির্ভর করে ওজন। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আপনার শরীরের গড়ন বা হাড়ের কাঠামো। হাড় যদি পাতলা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ওজন কম হবে। মোটা হাড়ে ওজন বেশী তো উঠবেই। সেইজন্যে আপনার উচ্চতা আর হাড়ের গঠন অনুযায়ী সঠিক কিনা সেটা জেনে নিয়ে সেইভাবে ওজন বাড়ানো বা কমানো উচিত।

যদি আপনার শরীরে কোন রোগ না থাকে অথচ উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কম হয় তাহলে ওজন বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে। সময় মতন সুষম খাদ্য, বিশ্রাম আর ব্যায়াম ওজন বাড়াবার একমাত্র উপায়।

খাওয়া ঃ স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম কথা ঠিকঠাক সময়ে ঠিকমতন খাদ্য গ্রহণ। সুতরাং আপনার হাতে যত কাজই থাক অথবা আপনি যেখানেই থাকুন প্রতিদিন খাবারের সময়টা কিন্তু আপনাকে ঠিক রাখতেই হবে। আর সর্বদা চেষ্টা করতে হবে বেশী করে খাবার। যদি একসঙ্গে বেশী না পারেন তাহলে অল্প অল্প করে সারাদিন খাবেন। খাদ্যের মধ্যে পাঁচটি নিয়মিত উপাদান ছাড়াও মাখন, ঘি, তেল, ভাত, আলু, মিষ্টি, জ্যাম-জেলী, আইসক্রীম, লজেন্স, টফি এইসব বেশী করে খাবেন।

দুপুরে আর রাতে প্রধান দুটি খাদ্যের মেনু কিন্তু খুবই যত্ন আর চিন্তা করে করতে হবে। এই দুটি সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকে টুকটাক কিছু খাওয়া বন্ধ করবেন। নাহলে টুকটাক খেয়ে পেটটা মোটামুটি ভরা থাকার ফলে খাবার আগ্রহই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই সময়ের এই প্রধান দুটি খাদ্য যাতে বেশ ক্ষিধে নিয়ে মুখরোচক স্বাদু জিনিস খেতে পারেন সেই চেষ্টা করা উচিত। একই খাবার প্রতিদিন খাবেন না। নৈমিত্তিকতার একঘেয়েমিতে খাবার আগ্রহ এতে কমে যাবে। খুব পরিশ্রমের পর বা খুব বেশী রোদ থেকে এসেই খেতে বসবেন না কখনো। দুপুরে খাবার অন্তত পনেরো মিনিট আগে স্নান সেরে নেবেন। এ নিয়ম আমাদের সাধারণ জীবনে চিরকালই প্রচলিত আছে। সারাবেলার ক্লান্তির পর ধারাস্নানে শরীরের শিরা উপশিরায় সুষ্ঠু রক্ত চলাচলের ফলে যে তৃপ্তিকর প্রশান্তি আনে, তাতে সমস্ত পরিশ্রম বোধ নষ্ট হয়ে গিয়ে খাওয়ার বেশ একটা আগ্রহ জাগায়। যদি ইচ্ছে করেন তাহলে স্নানের পর মন প্রফুল্ল হয় পছন্দমতন এমন গানবাজনা কিছুক্ষণ শুনে তবে খেতে বসতে পারেন। খাবার ঘরের

পরিবেশ আর পরিজন যাতে আনন্দদায়ক হয় সে ব্যবস্থা করতে পারলে তো খুবই ভাল হয়। আসলে সারাদিনের কাজকর্মের মধ্যে খাওয়াটা শুধু যে একটা দায়সারা পেট ভরানো কর্তব্যই নয় এ কথাটা মনে রাখা উচিত সব সময়। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই খাবার সময় গানবাজনা, খাবার টেবিলে ফুলের গুচ্ছ দিয়ে সুখকর পরিবেশ তৈরী করে নেবার প্রচলন আছে। জাপানে ঘরে ঘরে খাবার পরিবেশনের শিল্পিত রীতির কথা তো আজ সারা পৃথিবীতে কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমাদের দেশের মানুষ—বিশেষ করে মেয়েরা সব কাজের পরে দিন শেষে দায়সারার মতন করে রাখেন খাবার সময়টাকেই।

ত্ববেলা খাবার আগে খোলা জায়গাতে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস প্রশ্বাস টেনে টেনে নেবেন আর ছাড়বেন। অন্তত দশমিনিট এরকম করবেন রোজ। এতে আপনার শরীর হাল্কা আর মন প্রফুল্ল লাগবে, সঙ্গে সঙ্গে খাবার প্রতিও বেশ একই আগ্রহের ভাব দেখা দেবে।

খাওয়া হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শুয়ে বা বসে পড়বেন না। কিছুক্ষণ একটু খোলা জায়গায়—অন্তত পক্ষে বারান্দায় বা দরজা-জানলা খোলা কোনো ঘরের মধ্যেই খানিকটা হাঁটাচলা করে তারপর বেশ আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে কয়েকঘণ্টা ঘুমোবেন। ত্ববেলা এই রকম তৃপ্তি করে বেশ বেশী পরিমাণ খাওয়া আর প্রচুর ঘুম মোটা হবার প্রধান উপায়। খাবার পরে বা বিশ্রামের সময় কোন কারণেই বিরক্তিকর এমন কিছু না ঘটে যাতে স্নায়ুতন্ত্রী উত্যক্ত হয়ে উঠে আপনার মনের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন। মনের সঙ্গে শরীরের সোজাসুজি সম্বন্ধ থাকায় এতে হজমের বিশেষ বিঘ্ন ঘটতে পারে।

মনে রাখবেন সুন্দর শরীর আর মধুর লাবণ্য পেতে গেলে শরীরকে আরাম আর পরিচর্যা দিতে হবে তার চাহিদা মতনই। নাহলে সমস্ত শরীরটা ঘিরে আপনার একটা টলটলে সুখের লালিত্য ফুটবে কেমন করে? কবির ভাষায় যে "ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি" সেকি এত সহজেই 'অবনি বহিয়া যায়?'

ওজন নিয়ে ভাবনাচিন্তা

আমাদের দেশের অর্থাৎ ভারতীয় মেয়েদের গড় উচ্চতা অনুযায়ী ওজনের একটা তালিকা দেওয়া হলো। নিজের নিজের উচ্চতা দেখে সেই অনুসারে হিসেব করে ওজন কম বা বেশী হলে প্রয়োজন মতন ব্যবস্থা নেবেন।

	বয়স ঃ ২০	৩৫	৫০
উচ্চতা (সেন্টিমিটার)	ওজন (কেজি)		
১৪৮	৩৮·৬	৪৪·০	৪৭·১
১৫০	৪০·৩	৪৪·৮	৪৭·৭
১৫৩	৪১·৯	৪৬·৬	৪৯·৫
১৫৫	৪২·৮	৪৭·৭	৫০·১
১৫৮	৪৪·৯	৪৯·৫	৫২·১
১৬০	৪৬·০	৫০·৬	৫৩·০
১৬৩	৪৭·৩	৫২·১	৫৪·৯
১৬৫	৪৯·১	৫৪·১	৫৭·৩
১৬৮	৫০·০	৫৫·৬	৫৯·০

এই উচ্চতা অনুযায়ী ওজন যদি কারুর কম থাকে তাহলে ওজন বাড়াতে হবে। ওজন বাড়াবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো বেশী করে ভাত আর স্টার্চ জাতীয় জিনিষ খাওয়া। সারাদিন খাওয়ার একটা তালিকাও এই সঙ্গে দেওয়া হলো।

সময়	খাবার
সকাল ৫টা থেকে ৬টা	১টা কলা, এক গেলাস ঘোল।
৮টা থেকে ৯টা	ছ' স্লাইস রুটি, ২৫ গ্রাঃ মাখন, দু বড় চামচ মিক্সড ফ্রুট জ্যাম. ১টা ডিমের পোচ, ১ গেলাস (২৫০ গ্রাম) দুধ, ১টা বড় কলা।

সময়	খাবার
দুপুর ১২টা থেকে ১টা	২০০ গ্রাম চালের ভাত, ১টা বড় আলু সেদ্ধ, তরকারি, শাক, বড় একবাটি ডালে এক চা-চামচ মাখন, ১০০ গ্রাম মাছ, ২০০ গ্রাম দৈ, সঙ্গে যতটা সম্ভব চিনি।
বেলা ৩টে থেকে ৩.৫০	১টা বড় আইসক্রিম।
সন্ধ্যে ৬টা থেকে ৭টা	দুটো বড় সন্দেশ ১ গেলাস (২৫০ গ্রাঃ) দুধ।
রাত ৯টা থেকে ১০টা	২০০ গ্রাম ভাত, কিছু সবজি সেদ্ধ, ঝোলে বড় বড় চার টুকরো মাছের আলু পটল আর ১০০ গ্রাম মাছ থাকা চাই, ২৫ গ্রাম মাখন, কিছু মিষ্টি আর ফল।

এই তো মোট সময় ধরে খাওয়া। এর মধ্যে যতটা সম্ভব টফি, লজেন্স, চকোলেট আর সঙ্গে সঙ্গে জল খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে।

ওজন অস্বাভাবিক বাড়াবেন না

একটু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই শরীর ভারী হয়ে যাবার একটা প্রবণতা দেখা যায়। বেশীর ভাগেরই কোমর, তলপেট অর্থাৎ শরীরের নিম্নাঙ্গে মাংস বা চর্বি জমে ওঠে বেশী। এর কারণ সাধারণত মেয়েদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীর চালনায় নিতান্ত অনীহা। স্কুল কলেজের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই যে দৌড়ঝাঁপ হয় বিয়ের পরই মেয়েরা আশ্চর্যজনকভাবে সে সব ভুলে গিয়ে শান্ত, স্থিতধী হয়ে ওঠেন। এর জন্যে দায়ী কিছুটা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, কিছুটা বা মেয়েদেরই একেবারে নতুন একটা পরিবেশে এসে সহজাত সঙ্কোচবোধ। এরপর আসে একটি দুটি করে সন্তান। আর আশ্চর্য, পৃথিবীর আর কোন দেশের মেয়েরা যে কথা কোনদিন কল্পনাই করতে পারেন না যে, শুধুমাত্র সংসারের গৃহিনীর কর্তব্য আর সন্তান একটা মানুষকে এমনভাবে ডুবিয়ে দিতে পারে যে, নিজের দিকে চোখ তুলে চাইবার বা নিজের কথা চিন্তা করবার শুধু সময় নয় সে ইচ্ছেটাই গৌণ

হয়ে ওঠে একেবারে। ফল যা হবার তাই হয়। কয়েক বছরের মধ্যে ফুলের মতন সুন্দর একটা যৌনন তার সবকিছু সম্ভার সত্ত্বেও শুধু একটু যত্ন আর পরিচর্যার অভাবে ফুলের মতনই ঝরে পড়ে অকালের নিশ্বাসে। তৈরি হয় এক মোটাসোটা সুগৃহিণী—স্নেহময়ী একটি মাতৃমূর্তি। গৃহিণীর কর্তব্যে ত্রুটিহীনভাবে সক্রিয়। সন্তানের সামান্যতম সুখ সুবিধের জন্যে যে কোন রকম ত্যাগ স্বীকারে উন্মুখ। কিন্তু সেই একান্ত বাঞ্ছিত কর্তব্যের দায়ে খেয়ালই থাকেনা যে, সংসারে এত সব অতি অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে এতটুকু সময়ের অভাবে, অযত্নে, অনাদরে কালো মেঘকে লজ্জা দেওয়া এক পিঠ চুল কবে থেকে যেন আস্তে আস্তে কয়েকটা কাঠিতে এসে ঠেকেছে। গোলাপের পাপড়ির মতন ঠোঁট নিষ্প্রভ, খসখসে। থলথলে পেটের মাংস, কোমরের বেড়ে হারায় ফিতের মাপ।

আলমারি পরিষ্কার করতে করতে হঠাৎ কোনদিন হয়তো হাতে উঠে আসে পুরনো একটা ছবির এ্যালবাম। ছেলেমেয়েরা গেছে স্কুল-কলেজে। স্বামী কর্মক্ষেত্রে। সেই ক্ষণিক অবসর মুহূর্তে হঠাৎ শুধুই এক অন্যমনস্ক কৌতূহলে হয়তো ওল্টালেন এ্যালবামের পাতা। হাসিমুখে চেয়ে আছে এক সুন্দরী তরুণী। কিন্তু কে এই লাবণ্যময়ী! মাথায় মস্ত খোঁপার অজন্তা ছাঁদে, উচ্ছল যৌবনে, শাড়ির ছোট ছোট ভাঁজগুলোতেও ঝরে পড়ছে যেন এক অজানা স্বর্গের সুষমা। সেই মাধুর্যের আবেশে মাখামাখি দুটি কালো চোখ ভেসেছে যেন কোন কল্পনার দেশে। সামনে খোলা রইল আলমারি। একটার পর একটা উঠে আসতে লাগল ছবি। খেলছে সে মাঠে। ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে। প্রতিটি গতি ভঙ্গিতে উচ্ছল প্রাণময়তা। এরপর বসে, দাঁড়িয়ে, কলেজের পথে, বাগানে গাছের আড়ালে, পিকনিকের দলে··· শুধু জীবন আর জীবন। হাসি আর প্রাণ। দেখতে দেখতে জ্বালাধরা চাপা একটা নিশ্বাসে চিনচিন করে ওঠে বুঝি মধ্যবয়সী বুকের ভেতরটা। চৈত্রের উদাস দুপুরে, সবাই কাজে চলে যাওয়া নিঃসঙ্গ বেলায় হঠাৎ মনে পড়ে একটা একটা করে এতগুলো দিন এমন করে কবে ঝরে পড়েছে

জীবন থেকে ? হাসির লাবণ্যে উচ্ছল, সুগঠনা, সুবেশা মেয়েটির সঙ্গে নিজের মেদবহুল স্থূল চেহারাটার তুলনায় এতদিন পর কি এক আশ্চর্য ব্যথা যেন গুমরে ওঠে বুকের ভেতরে—"সত্যি কি আমি এমন ছিলাম কোনদিন ? তবে কেন আজ···"ভেবে দেখুন আপনি এর মধ্যে পড়েন কি না। যদি পড়েন তাহলে অসহায় অনুশোচনায় আর সময় নষ্ট না করে এখন থেকে সাবধান হোন। নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত খাদ্য আর ব্যায়ামেই দিনে দিনে আপনার শরীরের অবাঞ্ছিত মেদ ঝরে গিয়ে বয়স অনুযায়ী সুন্দর হয়ে উঠবে শরীরের গড়ন। তবে এই নিয়ন্ত্রণ আর ব্যায়ামের আগে নিশ্চয়ই আপনাকে জেনে নিতে হবে যে আপনার শরীরের এই স্থূলতা বিশেষ কোন রোগের জন্যেই কিনা। আপনার পারিবারিক ডাক্তারই একথা আপনাকে জানাতে পারবেন ঠিকভাবে।

মোটা হওয়া যদি রোগের জন্যে না হয় তাহলে আপনার নিজের প্রতি অবহেলা আর খাওয়ার ক্রটিই এর কারণ বলে ধরে নেবেন। অর্থাৎ অতিরিক্ত চিনি, তেল, ঘি, মাখন বা কোনরকম চর্বিজাতীয় জিনিস, বেশি পরিমাণ ভাত, আলু, মিষ্টি, আইসক্রীম, জ্যাম-জেলি, টফি, লজেন্স এই সবের ওপর দুর্বলতা আপনার প্রচুর। আর যখন তখন, যাকে কিনা বলে সারাদিন মুখ চালানো, সেটি অভ্যেস করে নিয়েছেন বেশ পাকাপোক্ত ভাবেই। কিন্তু এই সাময়িক ভাল লাগার ফল যে কি তা সামনের বড় আয়নাটার মুখোমুখী দাঁড়ালেই কি টের পান না প্রতিদিন ? সুতরাং বেশ বেশি বয়স পর্যন্ত যদি সুন্দর একটি শরীর রাখতেই চান তাহলে বিশেষ সতর্ক হোন খাবার দাবার ব্যাপারে। তাই বলে কি আর বাড়িসুদ্ধ লোক আপনার সামনে একপেট সুখাদ্য খেয়ে উঠে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলবে আর আপনি সুন্দরী হবার বাসনায় সেদিকে চেয়ে চেয়ে শুকনো মুখে দীর্ঘশ্বাস ঝরাবেন এই বয়সে ? না, তা করবেন না। আপনিও আর পাঁচজনের মতনই স্বাদে-গন্ধে জিভে জল ঝরানো খাদ্য খাবেন বেশ পেট ভরেই। অনেকেরই ধারণা আছে যে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ 'ডায়েটিং' করতে হলে খেতে হবে একেবারে

না খাওয়ার মতন খুবই অল্প পরিমাণে। এ ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল। কম খেলে মানুষের নিষিদ্ধ ফলের প্রতি আগ্রহের মতন খাওয়ার প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে উঠবে। সারাদিন অন্য সব কাজকর্মের পাট উঠে গিয়ে মনটা শুধু ঘুরঘুর করবে রান্নাঘরের দরজায়। তাই ডায়েটিং করলেও সকলের সঙ্গে বসে আপনিও খাবেন বেশ পেটটি ভরেই, শুধু মনে রাখবেন যে শরীরে মেদ জমায় এমন জিনিষ অর্থাৎ ৯৪ পৃষ্ঠার তালিকায় আছে যে নামগুলো সেগুলো থেকে দূরে থাকবেন শত হাত। অবশ্য বেশ পেট ভরা মানে আকণ্ঠ ভরা যাকে বলে তেমনি করে খাবেন না আর রাতে খুব দেরীতে খাবার অভ্যেস থাকলে তা বন্ধ করতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি হাল্কা ধরণের খাবার খাবেন রাতে। আর বাদ দেবেন দিনের বেলার আরামের ঘুমটি। দিনের ঘুম শরীরের মেদ বাড়ায়। এরপর আছে খেলাধূলো। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় ক্লাবে ব্যাডমিণ্টন খেলার বেশ চল হয়েছে। আপনার বহুদিনের সঙ্কোচ আর সংস্কার কাটিয়ে সেইসব ক্লাবে যোগ দিন দেখবেন ফল পাবেন হাতে হাতে। আর নিতান্তই তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে যে কোন জায়গায় ভর্তি হোন সাঁতারের জন্যে। এছাড়া বাড়িতে দিনে অন্তত আধঘণ্টা স্কিপিং করুন। কাছে পিঠে খোলা মাঠ থাকলে দৌড়বার চেষ্টা করুন। ঘরের পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ যেমন জল তোলা, ঘর ঝাঁট দেওয়া প্রয়োজন না থাকলেও (অর্থাৎ ঝি-চাকর থাকলেও) করুন। সিঁড়ি ওঠানামা করাও বেশ ভাল ব্যায়াম। শরীরটা একেবারে আঁটসাঁট করে ধরে রাখবার জন্যে এইটুকু কষ্ট না হয় করলেনই দিনের মধ্যে কয়েকবার। আর এসব থেকেও সবচেয়ে ওপরে আছে অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ব্যায়াম বা যোগাসন করা। খানিকটা ধৈর্য নিয়ে আর কষ্ট স্বীকার করে নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মত স্থষ্ঠু ব্যায়াম আর আসন করতে পারলে ইন্দ্রলোকের অপ্সরীও বোধহয় লজ্জা পাবে আপনার অনুপম দেহ-সৌষ্ঠবের পাশে এসে দাঁড়াতে। কথাটা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে পরীক্ষা করে দেখুনই নিজে।

ওজন কমানোর খাদ্য তালিকা

সময়	খাবার
সকাল ৫টা থেকে ৬টা	এককাপ চিনি-দুধহীন চা, দুটো বিস্কুট।
৮টা থেকে ৯টা	হাতেগড়া আটার রুটি দুখানা, একটা ডিম, এককাপ দুধ, ইচ্ছে হলে খানিকটা শশা।
দুপুর ১২টা থেকে ১টা	৬০ গ্রাম চালের ভাত, ছোট একবাটি ডাল, তরকারি (যে কোন রকম) ১০০ গ্রাম মতন, সবুজ শাক খানিকটা, চর্বিহীন মাছ বা মাংস ৫০ গ্রাম, টম্যাটো ১০০ গ্রাম। এতে পেট না ভরলে সেদ্ধ সবজি খেতে পারেন ইচ্ছে মতন।
বেলা ৪টা	এককাপ দুধ-চিনি ছাড়া চা, দুটো বিস্কুট, একটা শশা বা কমলা লেবু।
সন্ধ্যে ৬টা থেকে ৭টা	মাখন তোলা দুধ এক কাপ, একটা বা দুটো সন্দেশ।
রাত ৯টা থেকে ১০টা	হাতে গড়া সাধারণ মাপের আটার রুটি চারটে, ছোট একবাটি পাতলা ডাল, পাঁচরকমের মেশানো সবজি আন্দাজমতন পরিমাণ।

মনের সঙ্গে শরীরের যোগ অনেকখানি থাকা সত্ত্বেও, সুন্দর শরীর রাখরে দায়ে কোনো ক্ষেত্রে মনকে কিছু কিছু কষ্ট দিতেই হয়। আপনার লজেন্স, চকোলেট, আইসক্রিম এইসব জিনিসের প্রতি দুর্বলতা প্রচুর। সারাদিন টুকটাক করে এইসব মুখে ফেলতে চায় হয়তো মন। কিন্তু তা বললে তো চলবে না। সুন্দর সুঠাম একখানা শরীর চাইবো অথচ তারজন্যে কিছুটি ত্যাগ করবনা তাতো হতে পারেনা। তাই সব আগে ত্যাগ করতে হবে সারাদিন টুকটাক খাওয়া, বিশেষ করে জ্যাম, জেলি, মিষ্টি, পুডিং, কেক, কুলফি,

আইসক্রিম, রাবড়ি এইসব। দুবেলা মুখ্য খাদ্য আমাদের সবচেয়ে আদরের যে আলু সবআগে বাদ দেবেন তাকে। মূল জাতীয় সবজি আর বেশি ঝাল-মশলা বা তেল-ঘি দিয়ে রান্না খাবারও চলবেনা একদম।

ফলের মধ্যে বাদ দেবেন, কলা, আম, কাঁঠাল, বেল, খেজুর, বাদাম, কিসমিস এইসব।

চলবেনা বেশি পরিমাণ হুইস্কি বা সফ্‌টড্রিংক্‌স্। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করার সময় প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে জল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি যে, এতদিন অনিয়মিত বা যেমন ইচ্ছে খাওয়া দাওয়া করার ফলে মন বা শরীর অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো যে ধারায় তার থেকে হঠাৎ নিজেকে এমন একটা শক্ত নিয়মে নিয়ে আসতে প্রথম প্রথম মানসিক বা শরীরিক কষ্ট অসুবিধে খানিকটা হবেই। কিন্তু আমাদের শরীর আর মন এমনই একটি বস্তু যে যখন, যেখানে, যেমনটি অভ্যেস করানো যায় সহ্য হয়ে যায় তা ঠিকমতন।

তার থেকেও বড় যে কথা এ প্রসঙ্গে বলবার তা হলো, ডায়েটিং করার প্রথম দিকে শরীরের চর্বি যখন কমতে শুরু করে তখন শরীরের সাধারণ নিয়মে সেইসব জায়গা জলীয় পদার্থে ভরে ওঠে। ফলে প্রথম কয়েক মাস চর্বি কমা বোঝা যায় না মোটেই। এতে হতাশ বা নিরুদ্যম না হয়ে একই ভাবে খাওয়া দাওয়ার নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে গেলে ক্রমে ফল পাওয়া যাবে হাতে হাতে। সুতরাং মাভৈ।

৯১ পৃষ্ঠায় দেওয়া তালিকা দেখে নিজের শরীরের উচ্চতা অনুসারে ওজন ঠিক করতে হবে। তালিকার হিসেবের এদিক ওদিক দু / এক কিলো হলে ভাবনার কিছু নেই। পাঁচ / ছয় কিলো হলে সেই অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

তালিকা মতন নিজের উচ্চতা অনুযায়ী ওজন যদি ঠিক থাকে তাহলে মানান সই সেই সুস্বাস্থ্যকে সুন্দর করে ধরে রাখবার জন্যেও রোজকার খাবার খেতে হবে হিসেব করে। এখানে সেই হিসেবের একটা তালিকা দেওয়া হলো।

সময়	খাবার
ভোর ৬টা	এক কাপ চা, দুটো বিস্কুট।
সকাল ৮টা থেকে ৯টা	কর্ণফ্লেক্স সহযোগে এককাপ দুধ, ২ বা ৪ স্লাইস পাঁউরুটি টোস্টের সঙ্গে ১ চা-চামচ মাখন বা জ্যাম, ১টা কলা, ১ বা ২ কাপ কফি বা চা।
দুপুর ১২টা থেকে ১টা	১০০ গ্রাম চালের ভাত, ১ মাঝারি বাটি ডাল, খানিকটা শাক, ৫০ গ্রাম পাঁচ-মিশালি তরকারি, মাছ ৫০ থেকে ৭০ গ্রাম, চিনি বা গুড় ১ টেবিল চামচ, খানিকটা দৈ, সামান্য ফল।
বেলা ৪টা থেকে ৬টা	চায়ের সঙ্গে ইচ্ছেমতন জলখাবার। ইচ্ছে হলে এ সময় এক গেলাস ফলের রসও খেতে পারেন।
রাত ৯টা থেকে ১০টা	সাধারণ মাপের চারটে আটার রুটি বা ১০০ গ্রাম চালের ভাত, পরিমাণ মতন ডাল, তরকারি, ৫০ গ্রাম মাছ বা মাংস একটু মিষ্টি, এক গ্লাস দুধ।

নিরোগ শরীরে এই খাদ্য তালিকা মেনে চললে সুঠাম শ্রীতে ভরে উঠবে আপনার সমস্ত শরীর।

শরীর ও সৌন্দর্য রক্ষা করতে কি কি ব্যায়াম করা উচিত তার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া উচিত। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আজকাল ব্যায়াম খুব উপকারী এবং প্রয়োজন। শরীর সৌন্দর্য অনেকাংশে নির্ভর করে শরীরের গড়নের ওপর। সুতরাং ব্যায়াম করলে স্বাস্থ্য ও মন দুই ভাল এবং সুস্থ থাকে। তাই কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিনে বা রাতে, যে কোনো সুবিধে মত সময় করলেই হবে অল্প সময়ের জন্য। এখানে জেনে রাখা ভাল যে সাধারণতঃ পঁচিশ বছর বয়সের পরেই শরীর খুব আস্তে আস্তে শিথিল হতে শুরু

করে। নিয়মিত আর সঠিক ব্যায়ামের মাধ্যমে আবার সুন্দর শরীরের অধিকার সম্ভব। সঠিক বা আদর্শ গঠন বলতে কিছু বলা যায় না। তবে সৌন্দর্যের আসল রহস্য হল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সুসামঞ্জস্য আছে কিনা তাই বোঝা। শুধু ছিপছিপে হলেই যে তাকে দেখতে সুন্দর হবে তার কোন মানে নেই। আসল কথা হল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন হাত, পা, বুক, কোমর এবং পেছন ইত্যাদির সঠিক মাপ ঠিক করে তুলতে পারলে সাধারণ যে কোন নারীকে আকর্ষণীয় ও সুন্দর দেখাবে। হয়তো লক্ষ্য করেছেন বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরী মিস অমুক, মিস তমুক অনেক সময় মুখের চেহারায় সুন্দরী হন না কিন্ত তিনি বিশ্ব বিখ্যাত হয়ে যান তাঁর শরীরের গঠনের জন্যে। খোলামেলা আবহাওয়ায়, পাতলা ঘাস বা কার্পেটের ওপর ব্যায়াম করবেন। হাল্কা এবং ঢিলে পোষাক পরবেন। একেবারে খালি পেটে ব্যায়াম করবেন না। অল্প কিছু খেয়ে নেবেন ব্যায়ামের আগে। ভরপেট খেয়ে উঠে ব্যায়াম করবেন না। দু ঘণ্টা পর ব্যায়াম করলে ভাল। শরীর অসুস্থ থাকলে ব্যায়াম বন্ধ রাখবেন। ব্যায়াম প্রত্যেকদিন না করে সপ্তাহের যে কোন তিনদিন ঠিক করে নেবেন।

কিভাবে এসব ব্যায়াম করতে হবে এবং শরীরের কোন অঙ্গের জন্য, এইতালিকা দেওয়া হল সেই অনুযায়ী খুব সাবধানে মন দিয়ে করতে হবে।

(১) কোমর ও পেটের জন্যে

(২) উরু ও পেছনের জন্যে

(৩) কোমর, স্তন ও কাঁধের জন্যে কোমর ও পেটের ব্যায়াম :

সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। জোরে জোরে স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস করুন। এবারে বাঁ পা সোজা করে সামনে ছড়িয়ে ডান পা মুড়ে পায়ের পাতা বাঁ পায়ের উরুতে চাপ দিয়ে ঠেকিয়ে বসুন। দু হাত পেছনে নিয়ে আঙ্গুল আংটার মত জড়িয়ে ধরুন। দু হাত এবারে খুব শক্ত করে জোরে টেনে রেখে পেট ভেতরে ঢুকিয়ে খুব জোরে শ্বাস নিতে হবে। এক মিনিট এইরকম এইভাবে থেকে আবার আগের

মত ফিরে আসুন। পর পর ৫-৭ বার করার পর ডান পা দিয়ে আবার একই ভাবে করে যান। একদিনে বেশি করবেন না এবং মনে রাখবেন শরীর যতটা সম্ভব সংকুচিত হবে ততটাই করবেন। জোর করে কিছু করবেন না। আস্তে আস্তে ফল পাবেন যদি সঠিক ভাবে করতে পারেন।

উরু ও পেছনের ব্যায়াম ঃ

দু পা ফাঁক করে সামনের দিকে ছড়িয়ে বসে দু হাত পেছনে নিয়ে যান। কনুই সোজা করে তালুর ওপর ভর দিয়ে পিঠ একটু হেলিয়ে দিন। হাতের আঙ্গুল পেছন দিকে থাকবে। হাঁটু সামান্য মুড়ে পায়ের ওপর ব্যালেন্স করে শরীর তুলে দিন। এ অবস্থায় মাথাটা আলগা হয়ে ঝুলবে। যতটা পারেন পেটের দিকটা ওপরে তুলবেন। এ ভাবে ওপরে উঠিয়েই খুব আস্তে আস্তে মাটিতে পেছন স্পর্শ করেই আবার তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠান। পর পর দুবার করেই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবেন। এই সময় নিঃশ্বাস খুব স্বাভাবিক হবে।

কোমর, স্তন ও কাঁধের ব্যায়াম ঃ

লম্বা ভাবে দু পা ফাঁক করে দাঁড়ান। হাঁটু না ভেঙ্গে কোমর নিচু করে পায়ের গোছ অর্থাৎ গোড়ালিটা ধরুন। পেট ভেতরের দিকে ঢুকিয়ে গভীর শ্বাস নিয়ে পায়ের গোছ ধরে টানুন। এক মিনিট এই অবস্থায় থেকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। খুব আস্তে আস্তে এই ব্যায়াম অভ্যেস করতে হবে। হাই ব্লাডপ্রেসারের অথবা স্পণ্ডিলাইটিস জাতীয় কোন অসুবিধে থাকলে করবেন না।

সবশেষে এটুকুই বলতে পারি, সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক গঠন হলে আপনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দুই সুস্থ ও উজ্জ্বল থাকবে। সুতরাং আপনার সৌন্দর্যের চাবিকাঠি হল আঙ্গিকসমতা। তাই তালিকা অনুযায়ী ব্যায়াম করে আপনি বিফলে যাবেন না। তবে মনে রাখতে হবে, এবং খুব প্রয়োজন যে, কঠোর পরিশ্রম করে আপনাকে সারা বছর সব আবহাওয়াতেই ব্যায়াম করতে হবে। অনভ্যাসে আপনার সারা

শরীর হয়তো শক্ত হয়ে গেছে তাই নতুন করে উদ্দীপ্ত করতে হবে যাতে একদম গভীরে থাকা পেশীও সজাগ হয়ে ওঠে। প্রয়োজনে ব্যায়ামের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম অবশ্যই নেবেন। অনেকদিন যৌবন ধরে রাখতে হলে আপনাকে উপযুক্ত খাবার, ব্যায়াম, সুন্দর আবহাওয়া, মানসিক শান্তি এবং হাসিখুশি থাকতেই হবে।

গোপন স্বাস্থ্য

সবশেষে যা সবচেয়ে বড় কথা তা হলো, আপনার একেবারে ব্যক্তিগত কতগুলো সমস্যার কথা। যেমন:

(১) অবাঞ্ছিত লোম (২) অবাঞ্ছিত ঘাম (৩) মাসিক ঋতু (৪) শ্বেত স্রাব (৫) শরীরিক দুর্গন্ধ।

বেশবাস প্রসাধনের আগে রূপচর্চার গোড়ার কথা হলো ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য আর সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান বা ধারণা থাকা। অত্যন্ত যত্ন আর সতর্কতার সঙ্গে সেদিকে নজর রাখা।

অবাঞ্ছিত লোম: হাতে, পায়ে বা বগলে যে লোম থাকে তা যদি খুব ঘন বা ঔদাসিন্য বর্দ্ধিত হয় তাহলে তা খুবই দৃষ্টি পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে আজকাল হাতকাটা জামা বা নানারকম স্কার্টের যুগে এদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত। খুবই সহজভাবে নিয়মিত এইসব অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করার একমাত্র উপায় হলো কামানো। অনেকেরই এ সম্বন্ধে বেশ একটা ভীতি আছে যে নরম জায়গাতে ধারালো কিছু ব্যবহার করলে চামড়ার ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু এই ভয় একেবারেই অমূলক। স্নানের সময় সাবান দিয়ে চুলগুলো নরম করে নিয়ে হাত, পা বা বগল যেখানেই হোক ওপর থেকে তলার দিকে কামাবেন। অর্থাৎ ব্লেডটা ধররেন লোমের গোড়া থেকে বারমুখো করে। ব্যবহারের সময় ব্লেডটা যেন খুবই পরিষ্কার আর ধারালো থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। কামানোর পর একটুকরো তুলো একটু ডেটলে ভিজিয়ে অল্প করে লাগিয়ে নেবেন।

এরপর স্নান সেরে খুব নরম তোয়ালে দিয়ে জায়গাটা শুকনো করে মুছে বেশি করে ট্যালকাম পাউডার ছড়িয়ে দেবেন। কাজ হয়ে গেলে সমস্ত সরঞ্জাম ডেটল জলে ভাল করে ধুয়ে মুছে তুলে রাখবেন পরিষ্কার শুকনো জায়গায়। একজনের সরঞ্জাম অন্যে ব্যবহার করবেন না।

এছাড়া বাজারে বিভিন্ন নামী কোম্পানীর নানারকম ক্রিম বা লোশন পাওয়া যায়। যেগুলো বেশ সুবিধেমতন ব্যবহার করা চলতে পারে নিজেদের রুচি আর সামর্থ অনুযায়ী। তবে একটা কথা এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে যে, সব জিনিস সকলের ত্বকে সমানভাবে সহ্য হয়না। তাই আপনার নিজেরটা কেনবার আগে ভাল করে দেখে নেবেন সেটি আপনার ঠিকমতন সহ্য হবে কিনা। বগল বা কনুইয়ের নিচের দিকের চামড়ার ওপরে সামান্য একটু প্রলেপের মতন করে লাগিয়ে পরীক্ষা করবেন কোনরকম অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে কি না। বিন্দুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য, অর্থাৎ জ্বলুনি বা কুটকুটভাব বোধ হলে সেটি সঙ্গে সঙ্গে বাদ দেবেন। এছাড়া আপনার চামড়া যদি কোন কারণে রুগ্ন বা অসুস্থ হয় বা কোনখানে কোনরকম ক্ষত থাকে তাহলে কোনসময়েই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এ ধরনের কোন ক্রিম বা লোশন ব্যবহার করবেন না।

ব্যবহারের সময় সঙ্গে পাওয়া নিয়মাবলী খুব ভাল করে পড়ে সেইমতন সবকিছু মেনে চলবেন।

এছাড়া স্থায়ীভাবে লোম নষ্ট করে দেবারও কিছু ব্যবস্থা আছে। তবে সেই ব্যবস্থা খুবই ব্যয়বহুল। তা সত্ত্বেও তা নিতে আগ্রহী হলে কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের হাতে করাতে হবে কারণ এর জন্যে বিশেষ-ভাবে যে ইনজেকশানের ব্যবস্থা আছে তা নিজের হাতে করা কিছুতেই সম্ভব বা উচিত নয়।

হাতে বা পায়ে অনেকখানি জায়গাজুড়ে লোম থাকার ফলে ক্রিম বা লোশন দিয়ে বিশেষ সুবিধে হয়না। তাই এক্ষেত্রেও কামানোটাই সবচেয়ে সহজ পথ। কিন্তু যারা কামানো পছন্দ করেন না তাঁরা 'ওয়্যাক্সিং' (waxing) করে নিতে পারেন। কিন্তু প্রথম অন্তত

তিন চারবার ভাল কোন বিউটি সেলুনে অভিজ্ঞ হাতে করিয়ে নিতে হবে। পরে শিখে নিলে অর্থাৎ করতে করতে পদ্ধতিটা জানা হয়ে গেলে নিজেই করে নিতে পারবেন বাড়িতে।

অনেকের (নিশ্চয়ই মহিলা) মুখে বা ঠোঁটের ওপর পাতলা লোমের রেখা দেখা যায়। এর থেকে অবাঞ্ছিত লোম বোধহয় আর কোথাও হতে পারেনা। এই লোম নষ্ট করার উপায় হলো 'ব্লিচিং' (Bleaching) করা। এর জন্যেও নিয়মিত বেশ কিছু সময় আর ধৈর্য দেওয়া প্রয়োজন। আর waxing-এর মতন এও প্রথম প্রথম বেশ কিছুদিন কোন ভাল বিউটি সেলুনে গিয়ে করানো উচিত। যাঁদের বাড়িতেই করে নেবার সাহস বা সময় আছে তাঁরা এক আউন্স পেরোক্সাইডের সঙ্গে এক চা-চামচ এ্যারোমেটিক মিশিয়ে নিয়ে লোশনটা তৈরি করে নিন। এবার মুখে বেশ ভাল করে সাবান লাগিয়ে কুসুম গরম জলে ধুয়ে নরম তোয়ালে চেয়ে চেপে শুকিয়ে নিন। একখণ্ড তুলোয় লোশনটা ভিজিয়ে ঠিক লোমের ওপর ওপর আলতোভাবে প্রলেপের মতন লাগিয়ে নিন। এই সময় খুবই সতর্কভাবে হাত চালাতে হবে যাতে লোশনটা কোনরকমেই এদিক ওদিক লেগে না যায়। লোশনটা বেশ ভাল করে লাগানো হয়ে গেলে যতক্ষণ না শুকোয় অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে আবার লাগান একই প্রক্রিয়ায়। এইভাবে চার পাঁচবার লাগিয়ে জায়গাটা বেশ নরম আর ভেজা ভেজা করে ফেলুন। এবার একখণ্ড খুব নরম কাপড়ে খানিকটা ক্রিম নিয়ে একই জায়গায় লাগিয়ে দিন। দু মিনিট পরে আর এক খণ্ড নরম শুকনো কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে এক প্রস্থ মুছে ফেলুন। সবশেষে গজ বা খুব নরম আর পাতলা কাপড়ের টুকরো দিয়ে জায়গাটা বেশ শুকনো করে মুছে ফেলুন। দেখবেন অবাঞ্ছিত সব লোমগুলো কেমন সুন্দরভাবে কাপড়ের সঙ্গে উঠে এসেছে। চারপাঁচ মিনিট খোলা হাওয়া লাগতে দিয়ে পরে হালকা ধরনের কোনো ক্রিম বা লোশন না ঘষে শুধু থুপে থুপে লাগিয়ে নিন।

এরপর আছে একান্ত অবাঞ্ছিত ঘাম যা শরীরকে শুধু অস্বস্তিই

দেয়না, এর ফলে শরীরে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় তা নিজের একান্ত লজ্জা আর অপরের বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। তবে পরিমিত পরিমাণ ঘামেরও প্রয়োজন আছে শরীরকে সুস্থ আর সজীব রাখতে। কারণ শরীরের অনেক অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা শরীর থেকে বের হয়ে যায় ঘামের মধ্যে দিয়ে। তাই প্রয়োজন মতন ঘামকে বন্ধ করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। তবে সেই ঘামের ওপর ধুলো ময়লা জমে যেন ত্বকের ওপর একটা আস্তরের সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিত। গরমকালে দুবেলা খুব দামী আর সুগন্ধী সাবানের প্রচুর ফেনা করে স্নান করা উচিত। স্নানের সময় জলে একটু বাথসল্ট, ওডিকোলন বা গোলাপজল দিয়ে নিতে পারলে তো চমৎকার হয়। এছাড়া বাজারে নানারকম দুর্গন্ধনাশক Deodorant পাওয়া যায়। ঘামের গন্ধ নষ্ট করতে এগুলোও বেশ ব্যবহার করা চলে। যারা বেশি ঘামেন না তাদের এ সম্বন্ধে আর বেশি চিন্তা করবার কিছু নেই, কিন্তু অনেকের ঘাম এত বেশি মাত্রায় হয় যে স্রোতধারার মতন তা কপাল বেয়ে এসে সমস্ত মুখের প্রসাধন ধুয়ে তো দেয়ই অনেকক্ষেত্রে কাপড়-জামাও ভিজে গিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে প্রায় টসটস করে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রসাধন নিয়ে কোথাও যেতে হলে ঘাম নিরোধক (anti perspirant) ব্যবহার না করে উপায় নেই। কিন্তু মনে রাখবেন এই ঘাম-নিরোধক যেহেতু লোমকূপের মুখগুলো বন্ধ করে ঘাম বেরোনো একেবারে বন্ধ করে দেয় তাই বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া যখন তখন এর ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

এরপর যা নিয়ে আলোচনা তা হচ্ছে মেয়েদের স্বাস্থ্য যা স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মূল কথা। এই কথা হলো মাসিক ঋতু।

স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের সাধারণতঃ তেরো থেকে চোদ্দ বছর বয়সে মাসিক ঋতু শুরু হয়। প্রথমে কয়েকমাস কিছুটা কম হলেও সময়ের সঙ্গে চার থেকে পাঁচদিন স্রাব হয়ে থাকে। ঋতুস্রাব সুস্থ কিনা জানতে হলে কতগুলো অতি প্রয়োজনীয় জানবার বিষয় হলো ঃ

(১) **সময় ঃ** অর্থাৎ নিয়মিত নির্দিষ্ট তারিখ ধরে স্রাব হওয়া।

(২) **পরিমাণ :** বেশ সচ্ছন্দভাবে ভাল পরিমাণে স্রাব হওয়া।

(৩) **রঙ :** রক্তের রঙ উজ্জ্বল লাল থাকা।

(৪) **গন্ধ :** কোনরকম খারাপ গন্ধ না থাকা।

(৫) **জমা দোষ :** কোনরকম রক্ত জমা (clot) দোষ না থাকা।

(৬) **অস্বাচ্ছন্দ্য :** মাসিকের সময় কোনরকম পেটের যন্ত্রণা, বমিভাব বা অন্য কিছুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্যভাব না থাকা।

উপরের ঐ কটি তথ্য হলো ঋতু সুস্থ আর স্বাভাবিক কিনা তা জানবার সহজতম উপায়। এইভাবে নিয়মিত মাসিক ঋতু হলে আপনি সত্যিকার ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী বলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আর এর ফলে শুধু আপনার স্বাস্থ্যই নয় আপনার সমস্ত অবয়বে বর্ষাকালে জল পাওয়া সজীব লতাটির মতন ফুটে উঠবে একটা কোমল মসৃণ পেলবতা। তাই এই লক্ষণগুলোর কোনটির ব্যতিক্রম হলে সময় নষ্ট না করে পরামর্শ নেবেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের।

এরপর আছে সাদাস্রাব। মেয়েদের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের পক্ষে এরচেয়ে ক্ষতিকর আর বোধহয় কিছু হতে পারেনা। সাধারণভাবে জননেন্দ্রীয় নরম আর পিচ্ছিল রাখার জন্যে খুব স্বচ্ছ একরকম রস বেরোয়। এই রসের নিজস্ব কোন গন্ধ বা রঙ না থাকলেও বাইরের হাওয়ার সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাদা ভাবটা সামান্য হলদে রঙের হয়ে ওঠে। পরিমিতভাবে এই রস নিঃসরণের খুবই প্রয়োজন আছে। কিন্তু অনেকের মাসিক ঋতু স্রাবের আগে বা পরে কোন কোন ক্ষেত্রে সব সময়ই প্রচুর পরিমাণে সাদা স্রাব হয়ে থাকে। এতে দিনে দিনে শরীর শুকিয়ে ওঠে, মাথা ঘোরে, চোখের কোলে কালি পড়ে, মুখের বা হাতপায়ের চামড়া কুঁচকে ওঠে আর তার থেকেও বড় কথা বেশিদিন এইভাবে চললে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়ে অন্য যে কোন রোগের পক্ষে খোলা মন্দির হয়ে ওঠে সুতরাং এই ধরনের সাদাস্রাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবহেলায় বা ঔদাসিন্যে সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিচক্ষণ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অনেক সময় এই রোগের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

সুগন্ধ

বেসবাস বা প্রসাধন পরিচর্যার মধ্যে হাতপায়ের মতন সুগন্ধ ব্যবহারের প্রতিও বাঙালি মেয়েদের একট্য স্বভাবগত উদাসীনতা বা অজ্ঞতা দেখা যায় প্রায় সব সময়েই। কিন্তু গন্ধে, বর্ণে, রঙে, রসে ভরা পৃথিবীতে মানুষের মনও বাঁধা হয়ে থাকে একই সুরে। সুন্দর একটি ফুলের মধুর সুবাসে যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন আপনি ঠিক তেমনি আপনার প্রসাধনের সুচারু সৌন্দর্যের সঙ্গে আপনার সমস্ত অস্তিত্বখানি ঘিরে থাকা হালকা এক ঝলক সুবাস মানুষকে খুব সহজভাবে আকর্ষণ করবে আপনার দিকে। এই কারণেই প্রসাধনের মতন সুগন্ধ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানসম্মত কিছু জ্ঞান আপনার থাকা প্রয়োজন।

সমস্ত সুবাসের নির্যাসকে সাধারণত পাঁচভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়।

(১) বিশেষ একটি কোন ফুলের গন্ধ।

(২) মিশ্রিত ফুলের গন্ধ।

(৩) হালকা গন্ধ।

(৪) গভীর বা ভারী গন্ধ।

(৫) রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত গন্ধ।

এবার কোন নির্যাস কিভাবে কখন ব্যবহার করা এবং কার পক্ষে কেমন সুগন্ধ ব্যবহার করা চলতে পারে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

যে কোন সুগন্ধ ব্যবহারের আগে মনে রাখবেন যে সব গন্ধ সকলের ত্বকে সমানভাবে নেয়না। অর্থাৎ একই নির্যাস বিভিন্ন ত্বকের প্রকার ভেদে ভিন্নরকম হয়ে ওঠে। তাই লিপস্টিকের রঙ বাছাই-এর মতন সুগন্ধের বেলাতেও আপনার পছন্দ করা গন্ধটি আপনার ত্বকে

কেমন কার্যকরী হবে দেখে নিলে ভাল হয়। আপনার যদি শুধু একটিমাত্র নির্যাস কেনবার থাকে তাহলে হালকা বা ভারী ঠিক কোন গন্ধটি আপনি চান সেটাই সবচেয়ে আগে বিবেচনা করে তবেই নির্যাস বাছুন। এবার ডান আঙুলের ডগায় সামান্য একটু নিয়ে বাঁহাতের কব্জিতে ঘষে ঘষে মেখে খানিকক্ষণ সময় বসতে দিন। গন্ধটি আপনার ত্বকে বসে যাবার পরও যদি শিশির গন্ধের সঙ্গে মিশে যায় তাহলে বুঝবেন এটি আপনার ব্যবহারের যোগ্য সুগন্ধ।

আপনার প্রয়োজন যদি একটার বেশি থাকে তাহলে ভারী আর হালকা মিলিয়ে দু / তিন রকমের কিনতে পারলে খুবই ভাল হয়।

সাধারণভাবে আপনার নিয়মিত ব্যবহারের সুগন্ধটি আপনার নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য (Brand) হয়ে উঠলেও ঋতু পরিবর্তনে প্রকৃতির রূপের সঙ্গে সমতা রেখে এরও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। যেমন প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহে প্রাণ যখন আইঢাই, তখন উগ্র কোন গন্ধ শরীরে মনে বিরক্তি আনে আরও বেশি। তাই গরমের সময় দিনের বেলায় খুবই হালকা ধরনের প্রায় অস্পষ্ট মিষ্টি একটু সৌরভ তৃপ্তি দেবে দেহমনে। রাতের বেলাতেও দীর্ঘস্থায়ী মিষ্টি কোন গন্ধ, ফরাসী (কারণ এই ধরনের সৌরভ পৃথিবীর আর কোন দেশেই পাওয়া যায়না বড় একটা) নির্যাস অল্প করে ছড়িয়ে নেবেন শরীরে।

শীতকালে যদিও নেই এত বাছাবাছির বিড়ম্বনা, তবুও খেয়াল রাখতে হবে যে দিনের বেলায় বিভিন্ন পরিবেশে বেশি গভীর বা উগ্র গন্ধ ব্যবহার করলে তা সুরুচির পরিচয় হবে না।

সুগন্ধের ব্যবহার বিধি

বেশিরভাগ মেয়েরা একান্তভাবে যদি কোন সুগন্ধ ব্যবহার করেনই তাহলে তাও সব প্রসাধন শেষে ঠিক বেরোবার সময়টাতেই জামাকাপড়ের ওপরেই ছড়িয়ে বা লাগিয়ে নেন খানিকটা। কারণ

এ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা না থাকায় মনে করেন যে সুগন্ধ অনেকক্ষণ আগে থেকে দিয়ে রাখলে হয়তো বা উবে যাবে দামী সৌরভটুকু। এ ধারণাটা কিন্তু একেবারেই ভুল। বরং অল্প সময় দিলে কোন সুগন্ধই নিজেকে যেন গুছিয়ে নিতে পারেনা ঠিকমতন। কারণ কোন গন্ধই তো শুধু ওপর থেকে কোনরকমে ছড়িয়ে পড়েনা। গন্ধ নিজের মতন করে সময় নিয়ে আস্তে আস্তে ত্বকের মধ্যে বসে গিয়ে নিজেকে বিকশিত করে খুব ধীরে। কথাটা শুনতে কাব্যিক হলেও বাস্তব ঘটনা তাই। এইজন্যেই কোনরকম নির্যাস শিশি থেকে হাতে নিয়ে বা সোজাসুজি শিশির মুখ থেকে ঢেলে নেবেন না শরীরের যেখানে সেখানে। এ অভ্যেসে শুধু যে জিনিসের অপচয় হয় তাই নয় এর ফলে আপনার দামী জামাকাপড়ে হলদে বা পাঁশুটে ধরনের একটা দাগের সৃষ্টি হতে পারে।

প্রসাধনের শেষে বেরোবার অন্তত পনেরো / কুড়ি মিনিট আগে পাতলা একটুখানি তুলোয় করে খানিকটা নির্যাস ঢেলে নিয়ে দুই ভুরুতে, কপালে, রগের পাশে, কানের লতিতে, নাকের নিচে, গলায়, ঘাড়ে থুবিয়ে থুবিয়ে লাগান। এরপর তুলোটা হাতের কব্জি আর দুহাতের চেটোতে বেশ ভাল করে ঘষে ঘষে মেখে নিন। এরপর আর এক টুকরো পাতলা কাপড়ে নির্যাস নিয়ে বুকের ভেতর 'ব্রা'র সঙ্গে আটকিয়ে নিন পিন দিয়ে।

যারা স্প্রে দিয়ে গন্ধ ছড়ানো পছন্দ করেন বা এ ব্যাপারে একটু বেশি খরচ করতে দ্বিধা করেন না তারা নিজেদের সর্বাঙ্গে আর মাথার চুলে বেশ বেশি করে স্প্রে করে নির্যাসটা ভাল করে ছড়িয়ে নেবেন।

সুগন্ধ যাই ব্যবহার করুন তার মাত্রা কোন সময়েই সীমা ছাড়ানো উগ্র হয়ে মোহময় একটা আবেশের বদলে রুচি বিকৃতির পরিচয় বয়ে না আনে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে সব সময়।

অনেকেই বোধহয় জানেন যে সব নির্যাসই শিশি থেকে খুব তাড়াতাড়ি উবে যায়। তাই কেনবার সময় যেভাবে শক্ত করে শিশির মুখ রবার দিয়ে আটকানো থাকে প্রতিবার ব্যবহারের পর

শিশিটি রেখে দিতে হবে ঠিক তেমনিভাবে মুখ শক্ত করে বন্ধ করে। ব্যবহারের সময়ও মুখের ঢাকনা খুলে যতক্ষণ কাজ শেষ না হয় ততক্ষণ দিয়ে রাখবেন শিশির মুখে।

বেশি রোদের তাপ বা আলোতে নির্যাস উড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশি। এইজন্যে বেশি রোদ না আসা ঠাণ্ডা কোন জায়গায় সব সময় রাখবেন শিশিটি। রেফরিজারেটার থাকলে তার একেবারে ভেতরের দিকে নির্দিষ্ট একটি কোণে শিশিগুলো গুছিয়ে রাখবেন সুন্দরভাবে। এর ফলে নির্যাস শিশি থেকে উড়ে যাবে না আর ব্যবহারের সময়ও নির্যাসের সৌরভের সঙ্গে হিম জড়ানো এক প্রশান্তি আপনার সর্বাঙ্গে ছড়াবে অনুপম মাধুর্য।

কেনবার আর বাছাই-এর জন্যে কতকগুলো নির্যাস যার ব্যবহার আর সমাদর প্রায় পৃথিবী জোড়া তাদের নামের একটি ছোটখাটো তালিকা করা গেল।

নাম	প্রস্তুতকারক
১। রোব্ দ্য-সোয়ার	কারভেঁ
২। পোজে সিঁঅ-দ্য-করদে	করদে
৩। রেজঁস	আঁভো
৪। শঁ-দারম	গেরলঁ্যা
৫। ডিয়র	ডিয়র
৬। কোটি	কোটি
৭। ইনটিমেট	
৮। মাদাম রসা	মারশোল
৯। টুইড	লেনথেরি
১০। টাজি	শালটন

ভেবে চিন্তে খাই

আমরা দিনে বেশ কয়েকবার খাবার খাই। সেইজন্যে সারাদিনে আমরা কি খাই আর খাবার পর সে খাদ্যের কি হয়, সে সম্বন্ধে জানতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কেন আমরা খাই আর না খেলেই বা কি হয় সে সম্বন্ধেও আমাদের বেশ ভাল রকম ধারণা থাকা উচিৎ।

একটা কথা প্রথমেই বলে নিই যে আমরা ভারতীয়রা যা আর যেমন ভাবে খাই মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে তা অত্যন্ত উপযোগী। যেমন সাধারণ ভাবে প্রতিদিন আমরা খাই ভাত, রুটি, ডাল, তরকারি। এর সঙ্গে যদি এক টুকরো মাছ, সামান্য দুধ বা দই, কাঁচা সব্জি। সামান্য ফল যোগ করা গেলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা। এর থেকে সুষম খাদ্য আর কিছুই হতে পারে না।

খাদ্যে পাঁচ রকম খাদ্যসার আছে। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন আর মিনারেল। আমাদের প্রধান খাদ্য যে ভাত তাতে আছে কার্বোহাইড্রেট। মাছ, মাংস, ডিম আর ডালে আছে প্রোটিন। তেলে ফ্যাট। কিন্তু অমরা যখন দুধ খাই, তখন তার মধ্যে পাই বিভিন্ন রকম খাদ্যসার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই খাদ্যসার জিনিসটা কি? শরীরের পক্ষে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন আর ফ্যাট প্রচুর পরিমানে দরকার। কারণ এগুলি শরীরে শক্তি দেয়। এই শক্তি বা এনার্জি শরীরকে সচল রাখে। শরীরে ভিটামিন আর মিনারেলের প্রয়োজন সামান্য। এরা শরীরে এনার্জি দেয় না কিন্তু একটি শরীরকে সুস্থ আর স্বাভাবিক রাখতে শরীরের মধ্যে যে হাজার রকম প্রক্রিয়া চলে তা যাতে ঠিক ভাবে সম্পন্ন হয় সেই তদারকি করে খাদ্যের মধ্যেকার মিনারেল।

এনার্জি

খাদ্য থেকে আমরা প্রধানত যা পাই তা হলো শক্তি বা এনার্জি। একটা মোটর গাড়ি চালাতে যেমন পেট্রোলের দরকার হয় আমাদের শরীর গাড়ি চালাতেও দরকার হয় তেমনি এনার্জি। এই এনার্জি পাবার জন্যে শরীর খাদ্যকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো আমাদের শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ কাজ করে। হৃৎপিণ্ড চলে অক্লান্ত। ছেদহীন শ্বসনের কাজ করে যায় ফুসফুস আর রাতে শোবার আগে যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তারও ঠিকঠিক কাজ চলে সারারাত ধরে। এইসব কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে শরীরের এনার্জির প্রয়োজন হয় দিনরাত। যে মানুষ যত বেশী পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ করেন তাঁর এনার্জি তত বেশী ক্ষয় হয়। ফলে খাদ্যেরও প্রয়োজন হয় তাঁর তত বেশী।

এখন কথা হচ্ছে যে, এই এনার্জি আমরা মাপবো কেমন করে? কাপড় যেমন মিটারে মাপা হয়, সময় মাপা হয় ঘণ্টা আর মিনিটে তেমনি এনার্জি মাপা হয় কিলো ক্যালরি দিয়ে। সাধারণভাবে একে ক্যালরি বলা হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের (সারাদিন কোনো কাজ না করলেও) পনেরশো ক্যালরির দরকার হয়। এছাড়া এগারোশো থেকে তেরশো ক্যালরি দরকার হয় সারাদিন সাধারণ কাজকর্ম করবার জন্যে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে দরকার হয় ছাব্বিশশো থেকে আঠাশশো ক্যালরি। শারীরিক গঠনে স্ত্রীলোক যেহেতু পুরুষের থেকে হালকা বা ছোট তাই তাদের ক্যালরির প্রয়োজন কম হয়। গর্ভধারণ আর বাচ্চাকে বুকের দুধ দেবার সময় স্ত্রীলোকের ক্যালরির প্রয়োজন বেড়ে যায়। শিশুদের ক্যালরি নির্ভর করে তাদের বয়স আর শারীরিক গঠনের ওপর।

আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন আর ফ্যাট থেকে শরীর এনার্জি পায়। এবার আমরা এদের সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করবো।

কার্বোহাইড্রেট

চাল, গম, বাজরা, জোয়ার এইসব দানাদার শস্যে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়। দানাহীন শস্য যেমন আলু আর কলার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় প্রচুর। চিনি আর গুড়ে যে জ্বালানি পাওয়া যায় তার আর একটা বড় গুণ হলো সহজপাচ্যতা। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চাল, গম ইত্যাদি আমাদের যেমন পেট ভরাতে সাহায্য করে তেমনি চিনি বা গুড় রসনাকে তৃপ্ত করে। সুতরাং প্রতিদিন এগুলি হয়ে ওঠে আমাদের প্রধান খাদ্য। এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে আমরা চার ক্যালরি এনার্জি পেয়ে থাকি।

প্রোটিন

তিনটি প্রধান খাদ্যপ্রাণের মধ্যে প্রোটিনের প্রয়োজন আমাদের সবচেয়ে বেশী। মানুষের শরীরে প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গ যেমন হাড়, রক্ত, মজ্জা, মাথার ঘিলু, চামড়া এমনকি চুলের প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। ইট দিয়ে যেমন গাঁথা হয় ইমারত, তেমনি প্রোটিন দিয়ে খাড়া রাখা হয় মানুষের শরীর। শরীরের কোনো প্রত্যঙ্গ যদি ক্লান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে তবে প্রোটিন তক্ষুণি তা মেরামত বা দরকার পড়লে বদলি করে। সুতরাং এক কথায় বলা চলে যে প্রোটিন না থাকলে আমাদের শরীর কর্মক্ষম থাকত না কিছুতেই। কার্বোহাইড্রেটের মতন প্রোটিনও শরীরের জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। সেদিক দিয়ে ধরতে গেলে এক গ্রাম প্রোটিন চার ক্যালরি জ্বালানি দেয় কিন্তু প্রোটিন ব্যবহার শরীরের পক্ষে একটা অপব্যবহার বলা চলে। সুতরাং আমাদের এমনভাবে কার্বোহাইড্রেট খাওয়া উচিৎ যা শরীরের জ্বালানির কাজ কুলিয়ে দিতে পারে। প্রোটিন তাহলে করুক তার নিজের কাজ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে শরীরের পক্ষে এমন দরকারি জিনিসটি আমরা পাব কি কি খাদ্য থেকে? মাছ, মাংস, ডিম আর দুধ হলো খুবই ভালো ধরণের জৈব প্রোটিন। পরীক্ষায় বসে ডিম যদি পায়

একশোতে নব্বই তো মাছ, মাংস আর দুধ পাবে একশোতে সত্তর নম্বর। তরি-তরকারিতেও প্রোটিন আছে তবে তার গুণগত মান খানিকটা নিচু। যেমন ডাল পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, গম-চাল পঁয়তাল্লিশ। এই দুরকম প্রোটিন যদি একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যায় তাহলে আমাদের খাদ্যগত গুণ নিশ্চয়ই বেশী ভালো হবে। যেমন, মাছ-মাংস যদি সব সময় খাওয়া সম্ভব না হয় বা যাঁরা নিরামিষ খান, তাঁদের পক্ষে ভাত বা রুটির সঙ্গে ডাল খেলে পাওয়া যায় প্রয়োজন মতন কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন। এর সঙ্গে যদি যোগ করা যায় খানিকটা দুধ বা দৈ তাহলে তো আর কথাই নেই। এর থেকে ভালো সুষম আহার আর হতেই পারেনা। এছাড়া আছে নানারকম বাদাম। সাধারণভাবে মানুষের ধারণা যে বাদামের গুণ পেতে হলে কাজু বা দামী বাদাম খেতে হবে। এ ধারণাটা কিন্তু ভুল। সস্তা দামের চিনেবাদাম দামী কাজু বাদামের থেকে রূপে বা গুণে কোন অংশেই কম নয়।

ফ্যাট

ফ্যাট আর তেল আমাদের খাদ্যে তৃতীয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যসার। সাধারণত আমরা বিভিন্ন ধরণের বীজের তেল, বনস্পতি আর ঘি থেকে ফ্যাট পেয়ে থাকি। এছাড়া দুধ, মাখন, ছানা, নানা রকম বাদাম থেকেও আমরা ফ্যাট আর প্রোটিন পেয়ে থাকি। ফ্যাট বা চর্বি শরীরের মধ্যে জ্বালানির কাজ করে আমাদের এনার্জি দেয়। এই এনার্জি কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিন থেকেও বেশী পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিনে যেখানে ক্যালরি পাওয়া যায় চার সেখানে এক গ্রাম ফ্যাটে পাওয়া যায় নয়। সুতরাং আমাদের আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে ফ্যাট যোগ করলে খাদ্যের পরিমাণ বেশী না করেও ক্যালরি পাওয়া যায় বেশী।

দেশ আর রুচি অনুযায়ী ভোজ্য তেলের ব্যবহারের অভ্যেসে তারতম্য হলেও গুণগত মান সাধারণত এদের একই। যেমন দক্ষিণ ভারতে ব্যবহার হয় নারকোল তেল। বাঙালী রসনায় পছন্দ সরষের

তেল। উত্তর ভারতে বেশী কম বনস্পতির স্বাদে, গন্ধে বা অভ্যেসে যাই হোক গুণগত মান কিন্তু সকলেরই এক। হালে সূর্যমুখী বীজ তুলো বীজ ইত্যাদি কিছু নতুন ধরণের তেলের চল হয়েছে। এই তেল বনস্পতি বা ঘিয়ের থেকে হালকা। বর্তমান খাদ্য বিশারদের মতে ভারি ধরণের ফ্যাট আমাদের শরীরের মধ্যে এক ধরণের উপসর্গ আনে যাকে বলা হয় "এ্যাথেরোসোলেরেসিস"। এর ফলে শরীরের ভেতরে রক্তবাহী নালীর গায়ে একটা স্তর পড়ে যায়। ফলে হৃদপিণ্ডে রক্ত প্রবাহের ধারায় বাধা পড়ে। হৃদপিণ্ডের বহু ধরণের রোগের উৎপত্তি হতে পারে এর থেকে। সুতরাং শরীরের জ্বালানির প্রয়োজনে ফ্যাট যখন আমাদের খেতেই হবে তখন রান্নায় ভারি তেল ব্যবহার না করে এইসব হালকা তেল ব্যবহার করা উচিৎ।

ভিটামিন

ভিটামিন শব্দটা শুনলেই আমাদের চোখে একটা সুস্বাস্থ্যের ছবি ফুটে ওঠে। সত্যি সত্যি আমাদের খাদ্যে ভিটামিনের অবদান অনেক। যে খাদ্য-সারের ঘাটতিতে শরীরে নানারকম রোগের উৎপত্তি হয় অল্প পরিমাণ ভিটামিনেই তার পূরণ হয় অনেকখানি। শরীরের সবকিছু কাজ ঠিকঠাক মতন চলে ভিটামিনের সাহায্যেই। বেশীরভাগ ভিটামিনের নামকরণ হয়েছে ইংরিজি বর্ণের আদ্যাক্ষর দিয়ে। যেমন ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, সি, ডি, ইত্যাদি। এর যে বিশেষ কোনো অর্থপূর্ণ কারণ আছে তা নয়। সব নিয়ে মোটামুটি বারো রকম ভিটামিন আছে।

ভিটামিন এর জন্যে আমরা দেখবার সাহায্য পাই। এই ভিটামিনের অভাব হলে নানারকম চোখের রোগ বা অনেক সময়ই দৃষ্টিহীনতা ঘটে। বিশেষ করে শিশুদের খাদ্যে যদি ভিটামিন এর অভাব হয় তাহলে প্রায়ই তাদের দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এটা একটা নিষ্ঠুর সত্য ঘটনা যে সুষম পৌষ্টিক খাদ্যের অভাবে, অর্থাৎ খাদ্যের ব্যাপারে ঠিকমত জ্ঞান না থাকার ফলে আমাদের দেশে হাজার

হাজার মানুষ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যায়। দৈ, দুধ, ঘি, ডিমের কুসুম আর মেটেতে যথেষ্ট পরিমানে ভিটামিন "এ" পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু শাক-সব্জি যেমন পালং, হেলেঞ্চা, মেথিশাক, পদিনা আর ধনে পাতা, গাজর, কুমরো এই সব, আর ফলের মধ্যে আর পেঁপে, আম, টম্যাটো প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" পাওয়া যায়। ভিটামিন "বি"-এর মধ্যে পড়ে "বি-১", "বি-২", "বি-৬", "বি-১২" প্রভৃতি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলাদাভাবে এদের নাম দেওয়া হয়েছে যেমন থিয়ামিন বলা হয়েছে ভিটামিন "বি-১"কে। "বি-২" হয়েছে রিবেফ্ল্যাবিন, পাইরিডক্সিন হলো "বি-৬" এছাড়া আছে জিয়াসিন, ফলিক এ্যাসিড, বায়োটিন, প্যানটোথেনিক এ্যাসিড। এই সব ভিটামিনের প্রত্যেকটির শরীর গঠন আর পোষণের আলাদা আলাদা কাজ আছে। এই সবের মধ্যে শরীরের শিরা উপশিরার পরিচালন ব্যবস্থা, ত্বক, চুল, জিব আর শরীরের কোষের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে রক্তে রক্ত কনিকার তৈরিও পড়ে। গর্ভ সঞ্চারে আর বাচ্চাকে দুধ দেবার সময় ফলিক এ্যাসিড আর ভিটামিন "বি-১২" এর বিশেষ প্রয়োজন হয়। এর অভাবে রক্তাল্পতা রোগ সৃষ্টি হয়। ডাল, দুধ, দৈ, মাখন, ছানা, ডিম, নানারকম সবুজ সব্জি, নানা জাতের বাদাম আর মাংসতে বি জাতীয় ভিটামিন পাওয়া যায়।

ভিটামিন "সি" হলো টক ধরণের ভিটামিন যা পাওয়া যায় নানা জাতের লেবু, আমলা, ফল বের হওয়া ছোলা, কুল, জাম, পেয়ারা, ফলসা, বাঁধাকপি, এসবে। এই ভিটামিনের অভাব হলে সর্দি কাশির প্রকোপ বাড়ে, দাঁত আর হাড়ের ক্ষতি হয়।

ভিটামিন "ডি" শরীরের হাড় মজবুত করে আর ক্যালসিয়াম যাতে হাড়ের মধ্যে ঠিকমতন পৌঁছয় সেদিকেও খেয়াল রাখে। মাখন, ঘি আর বিভিন্ন মাছের যকৃতের তেলে এই ভিটামিন খাদ্য হিসেবে পাওয়া যায়। এছাড়া সূর্যের রশ্মিতেও এই ভিটামিন মানুষের ত্বকে নিজে থেকেই তৈরি হয়।

খনিজ পদার্থ শরীরে একটা অপরিহার্য জিনিস। সাধারণ নুন বা

সোডিয়াম ক্লোরাইড জীবন ধারণের জন্যে একটি অবশ্য জিনিস। আমাদের দাঁতে আর হাড়ের ক্যালসিয়ামে যে সাদা খনিজ পদার্থ থাকে তা পাওয়া যায় দুধ, মাছ আর ডালে। লোহার মধ্যে যে লাল খনিজ পদার্থ আছে তা রক্ত কণিকা আর শরীরের কোষ তৈরির কাজে প্রয়োজন হয়। সবুজ শাক পাতা, জোয়ার, বাজরা, ডিম, মাংস আর বিশেষ করে কল বের হওয়া মেথির মধ্যে পাওয়া যায় প্রচুর। এছাড়া পাওয়া যায় কিসমিস আর খেজুর।

আলোচনায় আমরা দেখলাম যে ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ শরীর ধারণের পক্ষে যা অপরিহার্য জিনিস না পাওয়া যায় ফল, কাঁচা সব্‌জি, কাঁচা শাক পাতা এই সবে। আর সত্যি কথা বলতে কি এ ধরণের কাঁচা শাক সব্‌জি বা ফল আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় দেখা যায় না মোটেই। পাওয়া গেলে আমাদের খাদ্যের গুণগত মান যে অনেক বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সব শেষে বলি যে সংসারের দায়িত্ব যার হাতে থাকে তিনি পুরুষ বা নারী যেই হোন না কেন একটু ভেবে-চিন্তে প্রতিদিনের রান্নাবান্না আর খাওয়া যদি করেন অর্থাৎ ঠিকমতন সুষম খাদ্য যদি প্রতিদিন খাওয়া যায় তাহলে ডাক্তারের আর দামী ওষুধের থেকে সংসারটা বাঁচবে।
